গান্ধী-পরিকল্পনা

শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়াল

মূল্য দুই টাকা

গান্ধীজি-লিখিত

ভূমিকা

"আচার্য্য শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়াল সেই সব যুবকের একজন যাঁহারা দেশের সেবা করিবার জন্য স্বচ্ছল, এমন কি উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত পরিত্যাগ করিয়াছেন। উপরন্তু আমি যে জীবনের জন্য দাঁড়াইয়াছি তাহার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এই পুস্তিকাটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা মাত্র। আচার্য্য আগরওয়াল এই বিষয়ে আধুনিক গ্রন্থাদি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন মনে হয়। দুঃখের সহিত বলিতেছি যে পুস্তিকাটি যে পরিমাণ মনোযোগ দিয়া পড়া দরকার আমি তত মন দিয়া পড়িতে পারি নাই। তথাপি আমি এমন ভাবে ইহা পড়িয়াছি যে বলিতে পারি তিনি আমার মতামত কোথাও ভুলভাবে উপস্থাপিত করেন নাই। চরখা অর্থনীতির সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলা হইয়াছে বলিয়া কোনওরূপ দাবী ইহাতে নাই। এই পুস্তকখানি অহিংসার উপরে প্রতিষ্ঠিত চরখা অর্থনীতির সহিত লাভজনক হইতে হইলে হিংসামূলক শিল্প প্রসারের যে অর্থনীতি তাহার তুলনামূলক আলোচনা বলিয়া দাবী করা হইয়াছে—শিল্পপ্রসার হিংসামূলক এই হিসাবে যে তাহা শিল্পে অনুন্নত জাতির শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখকের যুক্তি আমার আগেভাগেই বলিবার প্রয়োজন নাই। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের প্রত্যেককে আমি এই পুস্তিকাখানি পড়িয়া দেখিতে বলি।"

গান্ধী-পরিকল্পনা

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা নীতি-হিসাবে পরিত্যক্ত হইবার পর হইতেই সর্ব্বদেশে পরিকল্পনা বিষয়টি তাৎপর্য্যপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে মজুরের হিতসাধন, গৃহনির্ম্মাণ ও বেকার সমস্যার মত কয়েকটি ব্যাপারে মাত্র পরিকল্পনা প্রযুক্ত হইত। কিন্তু সমরোত্তর কালে সুনির্দ্দিষ্ট অর্থনীতি আরও ব্যাপকতা লাভ করিয়া জাতীয় জীবনের সর্ব্বদিক অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাই সর্ব্বপ্রথম, এবং তাহা হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিকল্পনার হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমেরিকায় 'নিউ ডিল'এর প্রবর্ত্তন করিয়া ব্যবসা মন্দার কুফল এড়াইতে চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য জার্ম্মাণীকে প্রস্তুত করিবার জন্যই হিটলার তাঁহার চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা করেন। ইংলণ্ড এই ক্ষেত্রে অনেক পরে প্রবেশ করে ও ছোটখাট ও এলোমেলো পরিকল্পনা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে সামাজিক নিরপত্তার জন্য 'বিভারিজ প্ল্যান' এই দিকে একটি সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা।

ভারতবর্ষে বোধ হয় স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়াই পাশ্চাত্য আদর্শে পরিকল্পনা প্রস্তুতের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেস নিযুক্ত

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিই সর্ব্বপ্রথম একটি সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করিবার চেষ্টা করেন। কেন এই কমিটির কার্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আমাদের সকলের কাছেই সবিশেষ জানা আছে। বর্ত্তমানের তিক্ততা ও হতাশা হইতে সাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে সমরোত্তর পরিকল্পনা কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ সরকারী কমিটি সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। উপরন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস দিল্লীতে ভারতের অপেক্ষা বৃটেনের জন্যই দ্রুত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। হাউস অফ কমন্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহা হইতে ভারত সরকার নিয়োজিত এই সকল কমিটি যে ভারতের প্রধান প্রশ্ন স্বাধীনতার কথা এড়াইয়া যাইবার কৌশল মাত্র—এই সাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কোনই কারণ থাকে না। যে সময়ে দেশের জাতীয়তাবাদীদের দাবী শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন আটজন প্রসিদ্ধ শিল্পপতি বোম্বে পরিকল্পনা নামে পরিচিত পনের বৎসরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া দেশের প্রকৃত সেবা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের এই কয়েকজন ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীর আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি একথা মনে না করিয়া পারা যায় না যে পরিকল্পনাটি পাশ্চাত্য অনুকরণে একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মাত্র। এম, এন, রায়ও জনগণের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দশ বৎসরে পনের হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

আমার মনে হয় এইসব পরিকল্পনায় আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভিত্তিগুলির কথা বিবেচনা করা হয় নাই। পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক, যে কোনও পরিকল্পনা করা হউক না কেন,

নিছক পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করা চলিবে না। ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারে এমন একটি খাঁটি দেশী পরিকল্পনার উদ্ভব করিতে হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতে সুসংহত ও শক্তিমান গ্রাম্য সমাজ ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সমাজের ভিত্তি কুটীর শিল্প—যাহার মধ্যে মানবতা, সাম্য, ন্যায় ও শান্তি ও সহযোগিতার অস্তিত্ব রহিয়াছে। ভারতে এমন একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে যাহা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করিবার পরিবর্তে অন্য দেশকে পথের সন্ধান দিতে পারে এবং যাহার ফলে পৃথিবীতে সত্যই একটি নব ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনীতির এই দিকটিতে মহাত্মা গান্ধী গত বিশ বৎসর ধরিয়া দৃষ্টি দিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য মণীষিরাও মহাত্মার অর্থনীতি সমর্থন করিতেছেন। মহাত্মাজীর রচনা পড়িবার সুযোগ আমি পাইয়াছি, তদুপরি ব্যক্তিগতভাবে ভারতবর্ষের নানারূপ অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাই আমি সুসম্বদ্ধভাবে মহাত্মাজীর কল্পনা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি, দরকার মনে হইলে তাহার সমর্থন পাশ্চাত্য দেশের খ্যাতিমান অর্থ-নীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকের নজীর উদ্ধৃত করিয়াছি। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া মহাত্মাজী অনেক লিখিয়াছেন। অনেককালের বহু-ব্যবহৃত শব্দ এবং বাক্যাংশ যাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহাদের মত গোঁড়া অর্থনীতিবিদ নহেন। তাঁহার মতের সহিত প্রায়ই গভীর ভাবাবেগ জড়িত হইয়া থাকে, যাহা কঠোর অর্থনীতির আলোচনায় অবান্তর বলিয়া কেহ কেহ মনে করে। কিন্তু তাঁহার ঐ সব রচনায় আমরা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আভাস

পাই, যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে যুদ্ধক্লান্ত জগতে পুনরায় যুদ্ধ, শোষণ ও ধ্বংসের অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা প্রভৃতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে স্বাধীন ভারতই প্রথম সোপান। এই পুস্তিকাতে গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তাগুলি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সাজাইয়া দেওয়া হইল যাহাতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নানারূপ উপায় আলোচনা ও পরিকল্পনা হইবার সময় এই সমস্যাগুলির প্রতিও অকপট ও গঠনমূলক মতামত দেওয়া হয়। যাহারা ভারতের কল্যাণ কামনা করেন তাঁহাদের যদি আমি নূতন চিন্তার খোরাক জোগাইতে পারি তাহা হইলে আমি মনে করিব আমার এই পুস্তিকা প্রণয়নের শ্রম যথেষ্ট সার্থক হইল।

পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত নীতি

পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের অসংখ্য ধারা বর্ষণের মধ্যে আমাদের একটি মৌলিক কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে পরিকল্পনা একটি আদর্শ নহে, আদর্শে পৌঁছিবার উপায় মাত্র। বিজ্ঞাপিত ঔষধের ন্যায় প্রত্যেক পরিকল্পনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নিজেকে জাহির করে এবং সাধারণের কল্পনাতে মনে হয় পরিকল্পনাগুলির সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক গ্লানি দূর করিবার অলৌকিক ক্ষমতা রহিয়াছে। পরিকল্পনা জিনিষটি কিছু মন্দ নহে, তাহার পশ্চাতে দিব্য দৃষ্টি ও জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু যখন জটিল একটি পরিকল্পনা পরোক্ষে শোষণ করিবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়,

তখন পরিকল্পনাটিকে আমরা সন্দেহের চোখে না দেখিয়া পারি না।

কাজেই পরিকল্পনা মাত্রেই আমাদের সব কণ্টকাকীর্ণ সমস্যার সমাধান করিয়া মহত্তর পৃথিবীর পত্তন করিবে না। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। সোভিয়েট রাশিয়ার মত তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনিময়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারে। নাৎসী জার্মাণীর মত শ্রমিকের অবস্থা উন্নত করিয়া জীবনকে কঠোরভাবে বিরাট যুদ্ধোপকরণ তৈরীর কাজে নিয়োগ করা যাইতে পারে। আমেরিকার নিউ ডিল জাতীয় দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষার একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অথবা জাতীয় জীবনের সাময়িক বিশৃঙ্খলায় একটুখানি শান্তি দিবার ব্যবস্থা। কলোনি এবং অধীন দেশসমূহকে আরও শোষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া বিভারিজ পরিকল্পনা ইংরেজদের সামাজিক নিরাপত্তা আনিয়া দিতে পারে। পরিকল্পনা একটী বিরাট যন্ত্রের মত, ইচ্ছা করিলে তাহা ভাল অথবা মন্দ কাজে লাগানো যায়। কাজেই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই প্রধান বিবেচ্য।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? 'জীবনযাত্রার মান উন্নত করা' অথবা 'সম্পদ বৃদ্ধি করা' বলিলেই চলিবে না। বোম্বে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে "পনের বৎসরে মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ করিয়া তোলা"। জনগণের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে যদি তাহা সত্যই করা সম্ভব হয় তাহা হইলেও ব্যক্তিগত গড় আয় দ্বিগুণ করিয়া তোলা উপযুক্ত আদর্শ নয়। কেবল আহার্য্যের দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকে না, কাজেই অর্থনৈতিক মান মানবিক অথবা সাংস্কৃতিক মান হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা যায় না। কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী মনে করে

যে পরিকল্পনাতে মানুষের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ও গ্রহণ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যে এখন জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করা সম্ভব নয় বলিয়া সে দেশে পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতেছে পূর্ণভাবে কর্ম্মে নিয়োগ। ইহাও একটি পাপচক্র, কারণ কর্ম্মে নিয়োগ কোন আদর্শ হইতে পারে না,—উহা আদর্শে পৌঁছিবার পথ মাত্র। বলা হইয়া থাকে যে দেশের জনবল ও সম্পদ পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাইয়া পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে। শিল্পসম্প্রসারণও উৎপাদন বৃদ্ধির সহজাত পাপ—প্রাচুর্য্যের মধ্যে দারিদ্র্য এত প্রত্যক্ষ যে তাহা আমার আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই।

আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্য তাহা হইলে কি হইবে? প্রফেসর কোল বলেন "এমন একটি পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে যাহার লক্ষ্য হইল দেশের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া আয় এমনভাবে বণ্টন করা যাহা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া জীবন-যাত্রার মান নির্দ্দিষ্ট করিবে।"* প্রফেসর হাক্সলির মতে সুচিন্তিত পরিকল্পনার লক্ষণ ইহাই যে সমাজে পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হইলে "তাহা সমাজের রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া ন্যায়বান, শান্তিকামী, নীতিবান, প্রগতিশীল ও দায়িত্বপূর্ণ নরনারীর একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে পারিবে কি না।"‡ জনগণের পরিকল্পনার মতে "পরিকল্পিত অর্থনীতি-দ্বারা জনগণের প্রধান ও মৌলিক চাহিদা মিটাইতে হইবে"। এই প্রসঙ্গে আমি ডাঃ সান ইয়াত সেনের 'Three People's Principles'

* Principles of Economic Planning, p. 406

‡ Ends and Means, p. 32

—জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও জীবিকা এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিবার অপেক্ষা অপর কিছু ভাল বিষয়ের কথা ভাবিতে পারি না। দেশের সংস্কৃতি ও জাতীয় সভ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের পরিকল্পনা স্থির করা উচিত, এবং উহার প্রকৃতি জৈবধর্ম্মানুগ হওয়া চাই। পরিকল্পনা সমগ্র জাতির কল্যাণ ও সুখ বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত হওয়া উচিত, ব্যক্তি অথবা শ্রেণীবিশেষের নহে। আমার মতে পরিকল্পনার ইহা প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত পরিকল্পনার ফলে জনগণকে অত্যধিক সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব্ব করা উচিত হইবে না। আমাদের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে, টোটালিটেরিয়ান পরিকল্পনা করা চলিবে না। অত্যন্ত কঠোর ও সুবিস্তৃত পরিকল্পনা দেশের উপর চাপাইয়া দিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব বটে, কিন্তু এই আর্থিক উন্নতির কি মূল্য আছে যদি তাহার ফলে জনগণের আত্মার অবনতি হয়? কাজেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে রাষ্ট্র হইতে কোনও রূপ চাপ দেওয়া অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব কম করিতে হইবে। সেই গবর্ণমেণ্টই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল যাহা শাসন করে কম। পরিকল্পনাতে গণতন্ত্র বজায় রাখিলেই চলিবে না, উহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া উহাকে আরও বাস্তব ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি করিলেই চলিবে না আমাদের ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অনুন্নত দেশগুলির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র যেন নষ্ট না হয়। অধ্যাপক রবিন্স্ Economic Planning and International Order পুস্তকে বলিয়াছেন: "নিজ নিজ জাতিগত ব্যাপারে আগ্রহাতিশয্যের জন্য এই আন্তর্জ্জাতিকতা

বৃদ্ধি পায় তাহা ব্যবহার করিবার উপায় ততই লোপ পায়। অধ্যাপক কোল ঠিকই প্রশ্ন করিয়াছেন "বৈজ্ঞানিকদের মানুষের শ্রমের অধিক উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করিয়া লাভ কি, যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্দ্ধিত উৎপাদন ক্ষমতাই বেকার সমস্যা বাড়াইয়া তুলিতেছে ও কষ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে? শ্রম লাঘব করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া কি লাভ যদি তাহার ফলে ক্রমশই অধিক সংখ্যক লোকের কাজ যায় ও আয়ের পথ বন্ধ হয়? সে জগতের সম্বন্ধে আমরা কি বলিব যেখানে শস্য বপন করিবার পর আর্থিক অসুবিধা হইতে রেহাই পাইবার জন্য কৃষককে ফসল ভাল না হইবার প্রার্থনা করিতে হয়? আমরা যে এক অদ্ভুত পৃথিবীতে বাস করিতেছি তাহাতে কোনও ভুল নাই।"*

আমাদের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা তাহা বিক্রয় করিবার ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে দেখিতে পাইতেছি বেকার সমস্যার বৃদ্ধি, কষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক অবনতি। "আমরা শিল্পজগতে এক অদ্ভুত দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি: কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশই অধিক পরিমাণে জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে এবং সেই সঙ্গে জিনিষের চাহিদাও কমিয়া যাইতেছে।"† ইহা অতীব হাস্যকর অবস্থা যে বাস্তব সমৃদ্ধির মধ্যেই লোকে অনাহারে থাকিবে এবং অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য্যের মধ্যে অভাব থাকিবে। ক্রাব লিখিয়াছেন—

'যখন প্রাচুর্য্য হাসিয়া ওঠে—কয়েকজন মাত্র সে হাসি কুড়াইয়া নেয়।
আর যাহারা তাহার ভাঁড়ারের দিকেই শুধু তাকাইয়া থাকে
অথচ তাহার আস্বাদন পায় না,

* The intelligent man's Guide through world chaos p. 65

† Work, Wealth and Happiness of Mankind by H. G. Wells p. 523

তাহারা তো ঐ ক্রীতদাসদেরই মত
যাহারা খনির ভিতর গর্ত্ত খুঁড়িয়া মরে,
চারিদিকের ঐশ্বর্য্য যাহাদের দ্বিগুণতর গরীব করিয়া তোলে।'

ইহা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে আমাদের কষ্টের কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণাধিক্যে নহে। কারণ হইতেছে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার সংগঠন ও তাহার আদর্শ। পুঁজিবাদের সঙ্গে শুধু শোষণ ও বেকার সমস্যা দেখা দেয় নাই তাহা মানুষের কামানের বলি ও যন্ত্রের চাকায় পরিণত করিয়াছে। ব্যঙ্গের স্তরে লইয়া গিয়া তাহা ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছে। পুঁজিবাদ মানুষের স্বাভাবিকতা বিকল করিয়া দিয়াছে, এখন অত্যাচারী অর্থ কলোসাসের মত বিচরণ করিতেছে। স্বাধীনতা, ন্যায় ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া পুঁজিবাদ সাজাইয়া তুলিবার জন্য ব্যর্থ ও ঘৃণ্য চেষ্টা চলিতেছে বটে, কিন্তু এখন সকলেই জানে যে মখমলের দস্তানার নীচে রহিয়াছে লৌহমুষ্টি। যদি পুঁজিবাদের আধিপত্য টলিয়া ওঠে তাহা হইলে মাথা তুলিয়া ফ্যাসিজম অথবা নাৎসিজমের মত বর্ব্বর একনায়কত্বের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁহার Where Do we Go from Here নামক পুস্তকে পাশ্চাত্য দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন যে পুঁজিবাদী সমাজে গণতন্ত্র অসম্ভব। যেখানে বিরোধ প্রবল নহে সেখানে জোড়াতাড়া দিয়া পার্লামেণ্টারি শাসন বজায় রাখা যায়। কিন্তু বিপদ ও আপত্তি দেখিলে তাহা কঠোর বলপ্রয়োগে টোটালিটেরিয়ান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে না।

লর্ড কিন তাঁহার The End of Laissez-faire গ্রন্থে পুঁজিবাদের এই

সংজ্ঞা দিয়াছেন যে "মানুষের অর্থ উপার্জ্জন ও অর্থপ্রীতিকে গভীরভাবে সজাগ করিয়া তাহার উপরেই পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক যন্ত্র খড়া করা হয়।" ধনের এই প্রচণ্ড লোভের ফলে শোষণ, উপনিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি জটিল শৃঙ্খলের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ ও প্রাণহানি অনিবার্য্য। বার্নার্ড শ বলেন "পুঁজিবাদের বিবেক নাই, স্বদেশ নাই।" লাভ হইতেছে ইহার কাম্য, অর্থই ভগবান। ইহাকে আমরা মানবতার পরিবর্ত্তে "অর্থানুগত্য" আখ্যা দিয়া থাকি। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে "আমেরিকার ব্যবসায়ীরা জাতির আগে ওয়াল ষ্ট্রীটের কথা বিবেচনা করিয়া থাকেন।" অধ্যাপক সডি টাকাকে বলিয়াছেন "সভ্যতায় একিলিসের গোড়ালি।" "এখন যদি অর্থবিশারদকে বলা হয় যে টাকা মানুষের জন্য তৈয়ারী মানুষ টাকার জন্য নহে, তাহা হইলে সে মনে করিবে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে এ কথা যেমন এক সময় অবিশ্বাস্য ছিল, ইহাও তদ্রূপ।"* আমরা এক অর্থ-পাগল পৃথিবীতে বাস করিতেছি যেখানে পুঁজিপতিরাই শাসক। চাকোটিন যেমন বলিয়াছেন টাকা ও লাভের জন্য এই উন্মাদ নিরবচ্ছিন্ন অভিযানে জনগণের উপর নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু পুঁজিবাদের ভিতরেই তাহার ধ্বংসের বীজ রহিয়াছে, কারণ অসীম লোভ একদিন নিজের দিকেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ধ্বংস ও পতন আনিয়া দিবে। ব[illegible]সই যদি বপনের বিষয় হয় তাহা হইলে ফসলে যে ঝড় হইবে তাহা[illegible] আর আশ্চর্য্য কি? বিখ্যাত কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে আছে "উৎপাদন, বিনিময় ও সম্পদ লইয়া পুঁজিবাদী সমাজে যে বিপুল উৎপাদন ও বিনিময় যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে সেই যাদুকরের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে যে

*Money Versus Man P 108

নরকের দৈত্যকে উদ্বুদ্ধ করিবার পর তাহাকে শাসন করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।" তাহা হইলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? সময়ই সব কিছু নিরাময় করিয়া দিবে এই বিশ্বাসে আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। "গাড়ীর ঘোড়া ছুটিয়া পালাইলে ইহা যেন গাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার মত দেখায়। আপনি বলিতে পারেন, 'আমি করিবই বা কি?' কিন্তু আপনার অক্ষমতা গাড়ী চুরমার হইয়া যাওয়া নিরোধ করিবেনা।"*

ফ্যাসিষ্ট পরিকল্পনা

তিন প্রকার স্বতন্ত্র পরিকল্পনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রথম হইতেছে ফ্যাসিস্ট অথবা নাৎসী পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে ঔষধ রোগের চাইতেও খারাপ সন্দেহ নাই। ১৯৩৬ সালে হিটলার যে চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ফলে যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টাতে বেকার সমস্যা কমিয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্মে নিযুক্তের সংখ্যা বাড়িলেও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় নাই। পরিবর্ত্তে জাতির সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রসজ্জা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং জনগণ যাহাতে আহার্য্যের বদলে বন্দুককামান দাবী করে তাহাই শিখানো হইয়াছিল। নাৎসী অর্থনীতি ছিল যুদ্ধের জন্যই। এই অতিবিস্ফোরক অর্থনীতি একদিন বিদীর্ণ হইয়া সমস্ত পৃথিবীর ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। শ্রমিক শ্রেণীকে

*The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism, by Bernard Shaw—P. 40.

সংহত রাষ্ট্রের নামে ভুলাঁইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছিল বটে, কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীরা 'টাকা ঢালিয়া খুসীমত গান শুনিত।' প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়িষ্ণু ও কঠোর পুঁজিবাদ হইতেই ফ্যাসিবাদের জন্ম; তাঁহার 'কাজ শোষণ ও লোভের পথ প্রাণপনে পরিষ্কার রাখা। ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনায় ব্যক্তির সত্তা অত্যন্ত কঠোরভাবেই রাষ্ট্রের অধীন করিয়া তোলা হইয়াছে। "আজ পর্য্যন্ত যতরকম মূর্ত্তিপূজা দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় মূর্ত্তিপূজার যুগে আমরা বাস করিতেছি; এ যুগে রাষ্ট্রকে দেবতার আসন দেওয়া হইতেছে।"* যে গণতন্ত্রে ব্যক্তির সত্তাকে' শ্রদ্ধা করা হয় তাহা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাদ্বারা দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক প্রোটোগোরাস বলিয়াছেন "মানুষই সকল বস্তুর মান।" কিন্তু এখন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে সকল নীতির মান নিয়ামক হইতেছে রাষ্ট্র। এথেন্সে আদর্শ ছিল টোটালিটেরিয়ান মানুষ। কিন্তু ফ্যাসীবাদী অর্থনীতি স্পার্টাকে অনুসরণ করিয়া টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে।

আমেরিকার 'নিউ ডিল'

আমেরিকায় দ্বিতীয় আর এক ধরণের পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের 'নিউ ডিলের' কথা বলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে 'নিউ ডিল' কখনই ঠিক পরিকল্পনা নহে। পুঁজিবাদকে এক দুঃসময়ের ভিতর দিয়া চালিত করিবার জন্য ইহা কতকগুলি

*The Totalitarian State against Man by Count Coudenhove-Kalergi P. 20

আইনের সমষ্টি মাত্র। যে সকল প্রত্যক্ষ কারণের জন্য সমন্বয়ের অভাব ঘটে তাহা দূর করিয়া পুঁজিবাদকে পুনর্গঠিত করিবার সচেতন চেষ্টা ইহাকে বলা যায়। রুজভেল্ট আমেরিকাতে একটি নূতন অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চান নাই ; তিনি পুরাতন ব্যবস্থা সংস্কার করিয়া কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুঁজিপতিরা যাতে অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করিয়া কার্য্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার জন্য পাবলিক ওয়ার্কের কাজ সুরু করা হইয়াছিল। কাজের সময় কমাইয়া মজুরীর হার বাড়ানো হইয়াছিল, আমদানী শুল্ক নূতন করিয়া ধার্য্য করা হয় ; রাষ্ট্র হইতে কৃষিপণ্য ক্রয় করিয়া কৃষি-জীবিদের সাহায্য করা হয় যাহাতে বাজার মন্দা হইতে না পারে ; এক একটি শস্যের মোট চাষের জমির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয় তাহার ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়ে। ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্র হইতে টাকা দিয়া তাহাদের আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় করিতে সাহায্য করা হয়। প্রকাশ্য বাজারে কেনা বেচা ও মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। এই সকল আইন প্রয়োগে আমেরিকা ব্যবসা-মন্দের হাত হইতে অনেকটা রেহাই পায়। দেখা যাইতেছে রোগ দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু উপসর্গের চিকিৎসা করা হইয়াছিল। "নিউ ডিল কোন প্রকার অনু-সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অগ্রসর হইবার জন্যও পরিকল্পিত হয় নাই ; আমেরিক পুঁজিবাদ যাহাতে আবার লাভজনক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছিল।"*

* Practical Economics by G. D. H. Cole p. 164

বৃটেনের পরিকল্পনা

বৃটেন তাহার সংরক্ষণশীল রীতি বজায় রাখিয়া পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও "দেখা যাক কি হয়" নীতি অনুসরণ করিয়াছে। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত বৃটেন পরিকল্পনাহীন অর্থনীতির একটি আদর্শস্থল ছিল একথা বলিলে সত্যের খুব কাছাকাছি বলা হয়। যুদ্ধের সময় এই স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিতে পারে না, কারণ তখন ব্যবসা, শিল্প, কৃষি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। যুদ্ধোত্তর ব্যবসা মন্দার পরে গ্রেট বৃটেন কিছু কিছু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই সকল আইনও টুকরা টুকরা বিচ্ছিন্ন এবং দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্যও কিছু নাই। বিশেষ অবস্থার চাপে পড়িয়া যাহা করা উচিত তাহাই যেন করা হইয়াছে। এই দিকে সর্ব্বশেষ কাজ হইতেছে বিখ্যাত বিভারিজ পরিকল্পনা। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সম্পূর্ণ কর্ম্মনিয়োগ এবং প্রত্যেক নাগরিকদের জীবনের সব রকম অবস্থায় জাতীয় সর্ব্বনিম্ন আয়ের ব্যবস্থা করা; বেকার ইনসিওরেন্স, অক্ষম অবস্থায় প্রাপ্য, বার্দ্ধক্যে পেন্সন, শিশুদের ভাতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি দিয়া এই সর্ব্বনিম্ন আয় বজায় রাখা হইবে। এই পরিকল্পনায় বড়লোকদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার সাহায্যে গরীবদের জীবনযাত্রার সুখসুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। ডিজরেলি বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ড গরীব ও ধনী দুইটি জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিভারিজ পরিকল্পনার মত কোনও স্কীমের প্রয়োগে দেশ, ডীন ইনজের ভাষায় "ট্যাক্স দাতা ও ট্যাক্স ভোক্তা

এই দুয়ে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।"* ইহা সত্য যে বেকার ইনসিওরেন্স 'ডোল' প্রথার মত গ্লানিকর নহে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ মাত্রাগত তাহা প্রকৃতিগত নহে। প্রথমে পুঁজি-পতিদের গরীবকে শোষণ করিতে দিবার পরে শোষণকারীদের কাছ হইতে ট্যাক্স আদায় করিয়া শোষিতদের আর্থিক সাহায্য করা—এই ধরণের পরিকল্পনা এইরূপ একটি বৃত্তের সৃষ্টি করে। সমগ্র বিষয়টিই অস্বাভাবিক, গ্লানিকর ও ব্যয়সাপেক্ষ।

সোভিয়েট প্ল্যান

তৃতীয় শ্রেণীর পরিকল্পনা হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার। রাশিয়াতে দুইটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিল তাহার কারণ উহার ভিত্তি পুঁজিবাদ হইতে স্বতন্ত্র। পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে শোষিত জনগণের মুক্তিদাতা সোভিয়েট-অর্থনীতি অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সুসংহত পরিকল্পনা দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়াতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হইয়াছিল একথা সত্য। দৃঢ় হস্তক্ষেপে পুঁজিবাদীদের উচ্ছন্ন করা হইয়াছিল। অসংখ্য হত্যা, রাষ্ট্রদ্রোহের বিচার, আপদ দূর করা প্রভৃতির ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টি 'সর্ব্বহারার একনায়ক' হিসাবে রাজত্ব করিতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল। তথাপি অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসে সোভিয়েট প্রচেষ্টা এক নূতন কীর্ত্তি, কারণ পুঁজিবাদকে তাহারা উচ্চ আসন হইতে নামাইয়া জনগণের স্বার্থের

*The Fall of the Idols p. 105

জন্য পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়াছে। জনস্বার্থ রক্ষা করিতে রাষ্ট্রই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক হইল। কাজেই পৃথিবীর অবনত শোষিত জাতিগুলির কাছে রুশ বিপ্লব স্বভাবতই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে এবং তাহাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে; যাঁহারা রুশ বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন তাঁহাদের অনেকে মোহমুক্ত হইয়া পড়িতেছেন। লুই ফিসার, ম্যাক্স ইষ্টম্যান, আঁদ্রে জিড, ফ্রেডা-য়্যুটলে প্রভৃতি যে সব লেখক ও চিন্তানায়ক বহুদিন সোভিয়েট রাশিয়ায় বাস করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রুশিয়ার পরীক্ষা পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহারা রুশ বিপ্লবের বর্ত্তমান গতি দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেশে এম, আর, মাসানির মত উৎসাহী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট পরিকল্পনার ফল দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সাম্যবাদী সমাজের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। 'সর্ব্বহারাদের একনায়কত্ব' সাময়িক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র লয় পাইবে কথা ছিল। সোভিয়েট সংগঠনের ভিত্তি হইবে গণতন্ত্র এবং বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সমাজ শ্রেণীহীন হইবার পরিবর্ত্তে এক নূতন ক্ষমতাবান শ্রেণীদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে—এই শ্রেণীকে পরিচালক শ্রেণী বলা যায়।* উপরন্তু আয়ের তারতম্য প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছে; প্রভেদ কোন কোন ক্ষেত্রে ৮০ : ১ এ দাঁড়াইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনও প্রকার সঙ্কোচ দূর করিতে নারাজ এবং সর্ব্বহারাদের একনায়কত্বে পরিণতি হইয়াছে জনগণকে সর্ব্বপ্রকারে অধীনস্থ করাতে। "এই একনায়কত্ব আর কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতেও নাই, ইহা বর্ত্তাইয়াছে একজন নেতার হাতে

* Burnhamএর Managerial Revolution

যিনি G.P.U. নামে গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। ইহারই আদর্শে হিটলার গেষ্টাপো তৈয়ারী করিয়াছিল।"* ইউ, এস, এস, আর, কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল তুলিয়া দিয়া ও 'ইন্টারন্যাশনাল' সঙ্গীত বর্জ্জন করিয়া আন্তর্জাতিকতার শেষ চিহ্নটুকুও লোপ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনিবার্য্য ফল রোধ করা প্রায় অসম্ভব ; তাহা হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ যদিও তাহা সমাজতান্ত্রিক। বর্ত্তমান যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যাহাতে বলা যায় যে রাশিয়া ক্রমেই এক বিরাট মেজাজি সোভিয়েট সাম্রাজ্য, একটু মিষ্ট করিয়া বলিলে সমাজতান্ত্রিক কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

এই রূপান্তরের মূল কারণ বাহির করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ও বিরাট পরিকল্পনায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাইতে বাধ্য এবং এই কাজে যে-দলের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে তাহা দূষিত হইবেই, সে দলের উদ্দেশ্য যত বড়ই হউক না কেন। অধ্যাপক জোআড তাঁহার Guide to the philosophy of morals and politics পুস্তকে বলিয়াছেন : "ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একনায়কত্বের স্বরূপ এমনই যে যত দিন যায় ততই তাহা না কমিয়া আরও চরম হইয়া দাঁড়ায়, সমালোচনা সম্বন্ধে আরও বেশী অসহনশীল হইয়া পড়ে।" আধুনিক জগতের ঘটনায় এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিহাসে আমরা যাহা শিখি কম্যুনিজমের থিওরী ঠিক তাহার বিপরীত। কম্যুনিজমে বলে যে একটি অবস্থায় আসিয়া একনায়ক-শাসন আপনার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া ইঞ্জিনের গতি বিপরীত-মুখী করিয়া দিবে, এক সময় যে স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল তাহাই আবার

* Socialism Reconsidered—M. R. Masani p. 20

ফিরাইয়া আনিবে। এই মতের ইতিহাস অথবা মনোবিজ্ঞানের সমর্থন পাওয়া যায় না।"

ইহা সত্য যে সোভিয়েট রাশিয়াতে রাষ্ট্রই উৎপাদনের সব কিছুর মালিক। কিন্তু প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয় হইতেছে রাষ্ট্রের মালিক কে? রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে টোটালিটেরিয়ান নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্ষমতা নায়ক ষ্টালিন ও তাঁহার আমলাতন্ত্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ডাঃ জ্ঞানচাঁদ তাঁহার Industrial problems of Indiaতে বলিয়াছেন—

"সমগ্র উৎপাদন কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারের ভয় আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য একজনের অধীনে থাকা খারাপ সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার কাজের জন্য রাষ্ট্রের অধীনতা আরও খারাপ।" অধ্যাপক জিন্‌দবার্গ তাঁহার Psychology of Society গ্রন্থে বলিয়াছেন, "যে কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কয়েকজনের শাসনে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। বলা হয় যে রাষ্ট্র লোপ পাইবে। তাহা হইলে একটি বলিষ্ঠ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উৎপত্তির সম্ভাবনা। সত্য সত্যই মঙ্গলময় কোনও পরিকল্পনা করিতে হইলে কেন্দ্রবিচ্যুতির দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে।"

Three Peoples' Principle—যথা, জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও জীবিকার ব্যবস্থা—এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই তিন শ্রেণীর পরিকল্পনা—যথা আমেরিকা, নাৎসী ও রুশ—আমাদের আদর্শ অপেক্ষা অনেক হীন হইয়া পড়ে। শেষটি অবশ্য জীবিকাসংস্থানের বিষয় অনেকটা সমাধান করে। কিন্তু জীবিকাই সব নহে, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

গান্ধীজির পরিকল্পনা

তাহা হইলে অন্য পথ কি? ইহার সমাধান রহিয়াছে সারল্যে, কেন্দ্রবিচ্যুতিতে এবং কুটীর-শিল্পে। যখন অন্যান্য অর্থনৈতিক মত আমাদের অন্ধগলিতে লইয়া যাইতেছে সেই সময় গান্ধীজির অর্থনীতি নূতন তাৎপর্য্য লইয়া দেখা দিয়াছে। এক সময় ছিল যখন গান্ধীজির অর্থনীতি অসার ও পাগলামি বলিয়া মনে হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতাতে শুধু আমাদের দেশে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে কেন্দ্রবিচ্যুত কুটীর-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কিরূপ তাহা গভীরভাবে আলোচিত হইতেছে। অধ্যাপক কোলের মত বিশিষ্ট বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ও স্বীকার করিয়াছেন যে "গান্ধীজির খদ্দর আন্দোলন একজন ভাবালু ব্যক্তির অতীতকে ফিরাইয়া আনিবার পাগলামি নহে, তাহা ভারতের গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য দূর করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার একটি কার্য্যকরী পন্থা।" কাজেই দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান সময়ে গান্ধীজির পরিকল্পনারই প্রয়োজন কারণ ইহা যুদ্ধক্লান্ত ও উত্যক্ত পৃথিবীতে শান্তি, গণতন্ত্র ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করিবে।

গান্ধী-অর্থনীতির মূলকথা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গান্ধীজির পরিকল্পনা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে গান্ধী-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত মৌলিক বিষয়গুলি বুঝিতে চেষ্টা করা ভাল। তাহা সঠিক বুঝিতে না পারিলে কেন তিনি কুটীর-শিল্প ও

কেন্দ্রবিচ্যুত উৎপাদনের উপর এত জোর দেন তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না।

সারল্য

মধ্যযুগীয় দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র বিষয়টি দেখিয়া গান্ধীজি ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘুরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন না। গান্ধীজি বাস্তব আদর্শবাদী বলিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার আসল রোগ ধরিতে পারিয়াছেন এবং তাহার নিরাময়ের জন্য যে ঔষধ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রাচীনপন্থী নহেন, অনেক বেশী প্রগতিশীল। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুগত উন্নতির উপরে জোর দিয়া বলে যে প্রগতিশীল ব্যক্তি অথবা জাতির লক্ষ্য হইল দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান ও বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করা। গান্ধীজি Hind Swaraj পুস্তকে দেখাইয়াছেন ; "শারীরিক সাচ্ছন্দ্যকেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লওয়াই হইল আধুনিক সভ্যতার সত্যকার পরীক্ষা।"

ভারতবর্ষের ইহা আদর্শ নহে। গান্ধীজি বলেন "মানুষের মন চঞ্চল পাখীর মত ; সে যত পায় ততই চায়, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না।" "আমরা কামনার যতই ইন্ধন জোগাই তত বেশী তাহা অসংযত হইয়া পড়ে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন সুখ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বড় লোক হইলেই যে সুখী এবং দরিদ্র অসুখী হইবে এমন কোন কথা নাই। দেখা গিয়াছে বড়লোকেরা প্রায়ই অসুখী হয়, অথচ দরিদ্র বেশ সুখী। ...এই সব দেখিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিলাসিতা ও সুখান্বেষণ হইতে দূরে থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ...আমরা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে

অক্ষম ছিলাম তাহা নহে, তাঁহারা জানিতেন যদি আমরা এই সব তুচ্ছ প্রয়োজন মিটাইতে আত্মনিয়োগ করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক গুণ হারাইয়া দাস হইয়া পড়িব। তাঁহারা তাই অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করেন যে যাহা আমাদের নিজের হাতপায়ের সাহায্যে করিতে পারি তাহা শুধু করা উচিত। তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের প্রকৃত সুখ ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে আমাদের হাত পায়ের উপযুক্ত ব্যবহারে।"* গান্ধীজি বলিয়াছেন, "প্রয়োজন বাড়াইয়া তুলিয়া এবং তাহা মিটাইবার জন্য যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া পৃথিবী যে তাহার লক্ষ্যের কাছাকাছিও পৌঁছিতেছে, এ বিশ্বাস আমার নাই।" "পাগলের মত দূরত্ব ও সময় দূর করিবার যে চেষ্টা হইতেছে আমি তাহা অন্তঃকরণে ঘৃণা করি, তেমনি ঘৃণা করি অভাব বাড়ানো এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই অভাব মিটাইবার উপাদান খুঁজিয়া বেড়ানোকে।"‡ ওয়েলস লিখিত Things to Come-এ থিওটকোপিউলাস বলিয়াছে, "এই প্রগতির অর্থ কি? ইহার প্রয়োজন কি? শুধুই অগ্রসর হইয়া যাওয়া। আমরা বলিতেছি একটু থাম, বিশ্রাম করিতে দাও'। জীবনের উদ্দেশ্য ত সুখে বাঁচিয়া থাকা।"

আধুনিক সভ্যতার প্রাচুর্য্যের নেশায় যাহারা ভরপুর তাহাদের কাছে গান্ধীজির মত বৈরাগ্যের ও দার্শনিকের বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্য ইহাই যে গান্ধীজি অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মূলীভূত কারণে প্রবেশ করিয়া আমাদের দুঃখকষ্টের মৌলিক কারণ ধরিতে পারিয়াছেন। একজন খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে "সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সঞ্চয়ী পুঁজিবাদের মতই একটি মত মাত্র।" উভয়ের মধ্যে অর্থ এবং অর্থদ্বারা লভ্য বিষয়কেই চরম

* Hind Swaraj p 87-88 ‡ Young India 17/3/1927

মঙ্গল বলিয়া মনে করে। এই কারণেই বার্ট্রণ্ড রাসেল বলিয়াছেন যে "যদি সমাজতন্ত্রের পত্তন হয়, উহা তখনই প্রকৃত উপকারে আসিবে যদি তাহা অর্থ দ্বারা কেনা যায় না এমন জিনিষের উপর অধিক মূল্য আরোপ করিয়া তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করে।"*

গ্রীক উপাখ্যানের নার্সিসাসের মত আধুনিক সভ্যতা নিজের ঐশ্বর্য্যের দ্যুতির প্রেমে পড়িয়াছে এবং সেই জন্যই মনে হয় আপনার প্রতি চাহিয়াই উহা বিলীন হইয়া যাইবে। অর্থ ও বস্তুর সন্ধানে পাগলের মত অনুধাবন পৃথিবীতে অনুভূতিহীন শোষণ, কঠোর সাম্রাজ্য-বাদ ও শোণিতাক্ত হত্যা আনিয়া দিয়াছে। জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া তাহা যদি পরিবর্তন করিতে না পারি তাহা হইলে অভিজ্ঞ অর্থনীতিকেরা যতই কৌশলী পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন না কেন, কিছুতেই অনিবার্য্য ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না। সত্যসত্যই আমরা বস্তুজগতের সহিত অত্যন্ত জড়াইয়া পড়িয়াছি, আমাদের সমস্ত শক্তি অর্থসঞ্চয়ে নিয়োজিত করিয়া মনে করি যে জীবনের তাহাই চরম লক্ষ্য। যাহা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম ছিল, সেই টাকাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পণ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং পৃথিবী তাহার অত্যাচারী শাসনে গোঙাইতেছে। সোনার জন্য পাগল রাজা মিডাসের তাৎপর্য্যপূর্ণ গল্পটি আমরা সকলেই জানি। এই গল্প হইতে আমাদের সময় থাকিতে শিক্ষা লাভ করা উচিত। কারণ আমরা যদি এই পাগলামি এখনও করি তাহা হইলে রাজা মিডাসের মত আমরা সকল জিনিষ সোনা দিয়া মূল্য স্থির করিতে চেষ্টা করিব, এবং প্রাণহীন স্বর্ণমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া আমাদের জীবন শেষ হইবে। সমাজকে সংহত রাখিবার জন্য অর্থই একমাত্র বিষয়

* Roads to Freedom

হওয়া উচিত নহে। এবং জীবনে একজনের ক্ষতিতে অপরের যে লাভ হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত নহে। সমাজের প্রকৃত সম্পদ হইতেছে সাধু ও সংস্কৃতিবান নরনারী; প্রাসাদোপম ঘরবাড়ী, প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী ও অসংখ্য বিলাসোপকরণ নহে। কবি বার্ণসের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যাইতে পারে,

"সাধুব্যক্তি দরিদ্র হইলেও মানুষের রাজা।"

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন "সঞ্চয়ের উপরে সঞ্চয় করিয়া কি ফল? শব্দের মাত্রা ক্রমশ বাড়াইলে আমরা কর্কশ ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই পাই না, সুর পাইতে হইলে শব্দকে সংযত করিয়া ছন্দের লহরীতে আনিতে হয়।"* খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় চিন্তানায়ক কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন:

"সকল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে ইন্দ্রিয়কে দমন করা। যাহার চরিত্র বিপরীত, যে তাহার ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না, সসাগরা ধরণীর অধিকারী হইলেও সে ধ্বংস হইবে।"

প্রাচ্যের অধিবাসীর কাছে এই সকল মত করামলকবৎ প্রত্যক্ষ। মাতৃস্তন পান করিতে করিতে এই সকল মতামত তাহার সত্তায় মিশিয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকের কাছে এই 'সাধারণ জীবন ও মহৎ চিন্তা' অসার ও ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। আধুনিক অর্থনীতি পাশ্চাত্য আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রাচ্য চিন্তাধারা উহার উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচ্যে বরাবরই একটি নিজস্ব অর্থবিজ্ঞান ছিল, এখনও আছে। তাহা পাশ্চাত্য অর্থনীতি অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে। কাজেই গান্ধীজি তাঁহার অর্থনৈতিক ধারণা জোর দিয়া প্রকাশ করিতে

* Thoughts from Tagore

আদৌ ইতস্তত করেন নাই, কারণ এই অর্থনীতি বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের। গান্ধীবাদের প্রধান নীতি হইল সারল্য। গান্ধীজি প্রগতির সঙ্গে জটিলতা মিশাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার মতে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর সারল্য আনিয়া দিবে যদিও তাহার ফলে পূর্ণতর জীবন লাভ করা যাইবে'।

গান্ধীজি মনে করেন শিল্পপ্রসারে অর্থের পশ্চাতে নিরবচ্ছিন্ন অনুধাবনা করিতে হইবে এবং তাহার ফলে চরিত্রের অবনতি ও মানবিকতার মূল্যহানি হইতে বাধ্য। "জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার মত প্রচলিত ধারণা হইতে স্বতন্ত্র। শিল্পপ্রসারের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে চাই না। আমি চাই আমাদের গ্রামগুলি শিল্প-প্রসারের ছোঁয়াচ হইতে দূরে থাকুক।"*

সরল জীবনযাত্রার নীতিগত ও মানসিক গুণ ব্যতীত তিনি প্লেটোর ভাষার অনুকরণে শিল্পপ্রসার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন অর্থের অনুধাবনে বাধা দিতে চান। কারণ কায়িক শ্রমদ্বারা আত্মস্থ না হইলে আমরা অর্থনৈতিক জটিল দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িব। জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ও সাধারণ সাচ্ছন্দ্যের জন্য দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে কেন্দ্রীকরণ তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং বলেন প্রত্যেক নরনারী নিজের শ্রমদ্বারা যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টা করুক। তিনি বলেন স্বাধীনভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশই আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রয়োজন শিল্পকে কেন্দ্রচ্যুত করা। অধিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আমাদের স্বাস্থ্যসম্পদবৃদ্ধির ও বিলাসোপকরণ জোগান দেওয়া সম্ভব হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে আমাদের জীবন প্রতি পদক্ষেপে নিয়ন্ত্রিত মনে হইবে এবং

* Harijan, 29/9/1940

আলডুস হাক্সলির The Brave New World এর স্যাভেজের মত স্বাধীনভাবে থাকিবার ক্ষমতা হারাইয়া আমরা অসুখী ও সহায়হীন বোধ করিব। "এ কথা ধরিয়া লইতে পারা যায় যে গণতন্ত্রের তখনই বাঁচিবার আশা,-পুনর্জন্ম লাভ করিবার আশাও বলা যায়, যখন আপনার নিজের জীবন স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এমন ব্যক্তিদের লইয়া সেই রাষ্ট্রের জনগণ গঠিত হইবে।"*

অহিংসা

গান্ধী-অর্থনীতির দ্বিতীয় কথা হইতেছে অহিংসা। যে কোনও আকারে হিংসা প্রযুক্ত হউক না কেন তাহা সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া স্থায়ী শান্তি আনিতে পারে না। খাঁটি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ একমাত্র অহিংস সমাজেই সম্ভব। হিংসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বলপ্রয়োগে যাহা লাভ হয় তাহা আরও অধিক বলপ্রয়োগে রক্ষা করিতে হয়। হিংসা প্রকৃত স্বাধীনতার পরিপন্থী। হিংসা দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহা মানবরক্ত স্পর্শে কলুষ হইয়া পড়ে। "কারণ যাহারা অসি ধারণ করে, অসির আঘাতেই তাহাদের শেষ হয়।" যেহেতু পরিকল্পনা সামাজিক উদ্দেশ্য লাভের একটি উপায় মাত্র সেইজন্য গান্ধীজি কিছুতেই হিংসা-নীতি অবলম্বন করিবেন না। যদি উহা শেষ লক্ষ্যও হয় তবুও তিনি একথা স্বীকার করেন না যে লক্ষ্যই পথের যাথার্থ্য স্থির করে, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা বজায় রাখিবার জন্য, উহা লাভার্থে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাহাও পবিত্র রাখিতে হইবে। তাই গান্ধীজি বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ আনিতে

* The Modern state p. 161

হইলেও অহিংস নীতি অবলম্বন করা উচিত। রক্তাক্ত বিপ্লবের সাহায্যে উহা স্থাপন করা উচিত নহে।

আমি বলিতে চাই এই অহিংস নীতি, কোনও ধর্ম্মের আবেগে প্রস্তুত নহে; এবং একমাত্র গান্ধীজিই ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন নাই। অধ্যাপক লাস্কি সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সমাজের গতি সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করিয়া হিংসা-নীতির ব্যর্থতা স্বীকার করিয়া, "সম্মতিদ্বারা বিপ্লবের" কথা বলিয়াছেন, সকল প্রকার দোষগুণের মধ্যে ঘৃণাই, যে ঘৃণা করে তাহার পক্ষে, ক্যানসারের মত কাজ করে। অপরের চরিত্রে আমরা যাহা নিন্দা করি, ইহা আমাদের চরিত্রে তাহাই আনিয়া দেয়।...আধুনিক জগতে বলের পিছনে অধিকার থাকা উচিত, যদি তাহাতে স্থায়িত্ব আনিতে হয়। ইউরোপের আধ্যাত্মিক গুণ সীজার অথবা নেপোলিয়নের কাছ হইতে পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গিয়াছে যীশুখৃষ্টের নিকট হইতে। প্রাচ্যের সভ্যতা চেংগিস খাঁ অথবা আকবর অপেক্ষা বহুলাংশে বুদ্ধদ্বারা প্রভাবান্বিত। আমরা যদি বাঁচিতে চাই তবে আমাদের এই সত্য শিখিতে হইবে। প্রেম দিয়া ঘৃণা জয় করিতে হইবে, ভাল করিয়া মন্দ দূর করিতে হইবে। নীচতা দ্বারা অনুরূপ বিষয়েরই সৃষ্টি হয়।"* Strategy of Freedom এ অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন, "আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক উপায়ে যে সমাধানে পৌঁছান হয় তাহা জোরজবরদস্তি দ্বারা লব্ধ সমাধান অপেক্ষা অধিক স্থায়ী হয়।" হ্যারল্ড লাস্কিকে ভাবালু চিন্তানায়ক বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

পৃথিবীতে গণতন্ত্র নিরাপদ করিয়া স্থায়ী শান্তি আনিবার উদ্দেশ্যেই গত মহাসমর হইয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মানীকে জোর করিয়া দাবাইয়া

*Grammar of Politics p. 239

রাখিবার ফলেই হিটলারের জন্ম হয়; হিটলারকে শক্তি দ্বারা পরাহত করিয়া জোর পূর্ব্বক শান্তি-প্রচেষ্টা করিলে হিটলার অপেক্ষা বড় কাহারও জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা। একথা বলিলে চলিবে না যে পৃথিবীতে হিংসা-নীতি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে এবং বুদ্ধ-গান্ধীদ্বারা তাহা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। সমাজের সহিত জৈবধর্ম্মের তুলনা দিয়া যে থিওরী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বহুকাল হইতে পরিত্যক্ত। এখনও যদি বলা হয় যে পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত থাকিবেই তবে তাহাতে ভুল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়। পুরাতন হিংসা-নীতি অবলম্বন করিয়া শান্তি, সুখ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। তাহাতে আমরা অতলস্পর্শী ধ্বংস ও মৃত্যুর কবলেই নীত হইব। পৃথিবীর আধুনিক গতি হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। এমন কি আটলান্টিক চার্টারেও স্বীকার করা হইয়াছে যে, "বাস্তব ও আধ্যাত্মিক কারণে পৃথিবীর সকল জাতিকে বলপ্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।" এই কারণেই আমার মনে হয় গান্ধীজির অহিংস-অর্থনীতি অকার্য্যকরী ভাবালুতা নহে, বরঞ্চ পৃথিবীর কঠোর বাস্তব স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান হতাশা হইতে উদ্ধারের একটি উপায়।

গান্ধীজির অর্থনীতিকে অহিংস-অর্থনীতি আখ্যা দেওয়া উচিত, কারণ অহিংসা তাহার অর্থনৈতিক চিন্তাকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পুঁজিবাদের ভিত্তি 'উদ্বৃত্ত মূল্য' শোষণ করিবার উপরে, এবং তাহা হিংসা-নীতি। যন্ত্রই পুঁজিবাদের প্রধান সহায়; যন্ত্র মজুর সরাইয়া দিয়া সামান্য কয়েকজনের হাতে সম্পদ জমা করিতে সাহায্য করে। সম্পদ এই ভাবে হিংসাদ্বারা আহৃত হইতেছে ও হিংসাদ্বারাই সংরক্ষিত হইতেছে। গান্ধীজির মতে অধিক উৎপাদন ও যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই

উৎপাদন একেবারেই চান না। গান্ধীজি বলেন, "আমি বলিতে চাই যদি ভারতবর্ষ অহিংস পথে চলিতে চায় তাহা হইলে বহু জিনিষকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে হইবে। কেন্দ্রীকরণ ও তাহা রক্ষা করা বলপ্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নহে। যে বাড়ী অত্যন্ত সাদাসিদে তাহা পাহারা দিবার জন্য পুলিশ দরকার হয় না। ধনীর প্রাসাদ ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিতে সশস্ত্র প্রহরী প্রয়োজন হয়। বড় ফ্যাক্টরীর বেলাতেও তাহা সত্য। ভারতবর্ষকে যদি গ্রাম্য ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয় তাহা হইলে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা কম; সহরে ভিত্তিতে ভারতকে গড়িয়া তুলিলে সেনাবাহিনী, নৌবল ও বিমানবাহিনী সত্ত্বেও বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী থাকিবে।"* গান্ধীজি বলেন, "ভারতের ভবিষ্যৎ পাশ্চাত্যের রুধিরাক্ত পথে গড়িয়া তুলিলে চলিবে না, সে দেশে ইতিমধ্যেই ক্লান্তির চিহ্ন দেখা দিয়াছে। সরল দেবভাবাপন্ন জীবনযাত্রার ফলে ভারতের ভবিষ্যত শান্তির পথে।" বর্ত্তমান সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি বলপ্রয়োগ নীতি সমর্থন করেন না। "যতদিন পর্য্যন্ত বুভুক্ষ জনগণের ও ধনীর মধ্যে ব্যবধান থাকিবে ততদিন অহিংস গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা অসম্ভব। স্বাধীন ভারতে নয়াদিল্লীর প্রাসাদ ও দরিদ্রের দীন কুটীরের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তাহা একদিনও থাকিবে না। কারণ তখন গরীবেরা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা ধনীর মত ক্ষমতাবান হইবে। যদি ঐশ্বর্য্য ও তজ্জাত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত না হয় তাহা হইলে একদিন না একদিন রক্তবিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবেই। আমি যে 'সচ্ছি'র কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি বহু বিদ্রূপ বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার উপর জোর দিতেছি। সত্য কথা যে তাহা লাভ করা কঠিন।

*Harijan. 30-1932 & Young India 1-30-1926

"......হিংসা-নীতি যে কী তাহা আমরা জানি। কোনও পাইবে না।" সফল হয় নাই। রাশিয়া অনেকখানি সাফল্য দাবী করে, কিন্তু ম করেন তাহাতে সন্দেহ আছে। এই দাবী বিনা তর্কে স্বীকার করিয়া লইবার সময় এখনও হয় নাই। আমাদের অহিংস-নীতির এখনও পরীক্ষা চলিতেছে। লোককে দেখাইবার মত আমরা এখনও কিছুই লাভ করি নাই, কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়াই উল্লেখ করিতে পারি যে অতি ধীরে ধীরে এই নীতি সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হইতেছে। অহিংসায় অপরকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে হয়, তাহা করা সম্ভব হইলে স্থায়ী ফল লাভ হইবে। অহিংস-নীতিতে সমাজ অথবা রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে ভিতর অথবা বাহির হইতে সর্ব্বপ্রকার আঘাত সহ্য করিতে সক্ষম হইবে।"*

অধ্যাপক হাক্সলিও বিশ্বাস করেন যে "কোনও অর্থনৈতিক সংস্কার যতই কাম্য হউক না কেন ব্যক্তি ও সমাজে ঈপ্সিত পরিবর্ত্তন আনিতে তাহা যথেষ্ট নয়, যদি ঐ সংস্কার কার্য্যকরী করিবার পথও কাম্য না হয়।" "রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র বিকেন্দ্রীকরণ করা ও স্বায়ত্বশাসনই কাম্য সংস্কার। এই সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিবার কাম্য পথ হইতেছে অহিংসার পথ।" গান্ধীজির মত অধ্যাপক হাক্সলিও রুশিয়ার সশস্ত্র সমাজতন্ত্রবাদ পছন্দ করেন না। "কঠোরতা অপ্রীতি সৃষ্টি করে; বলপ্রয়োগ দ্বারা এই অপ্রীতিকে দাবাইয়া রাখিতে হয়। বলপ্রয়োগের ফলে, সাধারণত বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সোভিয়েট পরিকল্পনার বেলাতেও তাহাই হইয়াছে—সাধু উদ্দেশ্য লইয়া যাহা কিছু করিতে চেষ্টা করা হইতেছে তাহার ফল হইতেছে বিপ্লবের প্রথম স্রষ্টাদের ঈপ্সিত ফল হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।"†

* Contructive Programme p 18-19. † Ends & Means p. 70.

গান্ধীজির অহিংস সমাজে শোষণের কোন পথ থাকিবে না, কারণ সেখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হইবে ভোগ করা, ভবিষ্যতে লাভজনক ভাবে বিক্রয় করা নহে। প্রত্যেক গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকিবে, কোনও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার প্রয়োজন থাকিবে না। তখনই সাধারণে প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে।

এই সব অহিংস গ্রাম-রাষ্ট্রগুলির ছোট ছোট সীমান্ত থাকিবে, কিন্তু একমাত্র আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করা ব্যতীত সাধারণভাবে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী গণ্ডীবদ্ধ থাকিবে না। আর্থিক ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃহত্তর জাতীয়তার অথবা চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নহে।

শ্রমের পবিত্রতা

গান্ধীজির অর্থনৈতিক সভ্যতার তৃতীয় প্রধান নীতি হইতেছে কায়িক শ্রমের পবিত্রতা স্বীকার করা। গান্ধীজির মতে প্রকৃতির বিধানই শ্রম করা, ইহার অন্যথায়ই আমাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক গোলমালের সৃষ্টি ; "ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের হাত কাজে লাগায় না। মানুষের এই প্রাকৃতিক দান অপব্যবহারজনিত অপরাধের জন্য প্রকৃতি এখন পরিশোধ লইতেছে।" * তিনি আরও বলেন "আমরা আমাদের অতুলনীয় জীবন্ত যন্ত্র অর্থাৎ আমাদের শরীর মরিচা ধরাইয়া ধ্বংস করিতেছি, তৎপরিবর্ত্তে প্রাণহীন যন্ত্রের আশ্রয় লইয়াছি।"†

* [illegible] † Young India 1 8-1-25

সেণ্টপল বলিয়াছেন "যে কাজ করিবে না সে খাইতেও পাইবে না।" এবং তাঁহার অহঙ্কার ছিল এই যে তিনি নিজের হাতে পরিশ্রম করেন কাজেই কোনও মানুষের কাছে তাঁহার কোনও দায় নাই। আমরা গীতায় পড়িয়াছি "কোনও রূপ শ্রম না করিয়া যে পৃথিবীর ফল উপভোগ করে, সে চোর পৃথিবী হইতে চুরি করিতেছে।" গান্ধীজির মতেও "শ্রমই সার্থক পূজা এবং অলস মন শয়তানের কারখানা।"

তিনি বলেন যে বুদ্ধিপ্রণোদিত কায়িক শ্রম মানসিক উৎকর্ষের জন্যই প্রয়োজন। মানসিক সংস্কৃতি সাধন করিতে হইলে কায়িক শ্রম নিতান্ত দরকার। আধুনিক মনোবিজ্ঞায় এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। গান্ধীজি পরিকল্পিত ওয়ার্ধা স্কীম নামে পরিচিত বনিয়াদ শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এই "কাজ করিয়া শিক্ষালাভের" নীতি মনোবিজ্ঞায় স্বীকৃত হইয়াছে। আমেরিকার ডিউইও শিক্ষার এই নীতির উপরে জোর দিয়াছেন। "কাজের মারফতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অন্য যে কোন উপায় অপেক্ষা জ্ঞান লাভের অধিক সহায়ক। ইহা দ্বারা সহজাত বুদ্ধি ও অভ্যাস উদ্বুদ্ধ হয়, ইহা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবার পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী।" অভিজ্ঞতা হইতে টলষ্টয় শিখিয়াছিলেন যে "কায়িক শ্রম মানসিক কাজের হন্তারক ত নয়ই, ফলে তাহা আরও উন্নত হয় ও তাহাকে সাহায্য করে।"* তাই তিনি কায়িক শ্রমকে অভিশাপ মনে না করিয়া জীবনের আনন্দের উৎস বলিয়া ভাবিতেন, কারণ শ্রমের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হয়, আনন্দ ও কার্য্যক্ষমতা বাড়ে এবং মনে উদারতার সঞ্চার হয় গান্ধীজিরও শ্রমের পবিত্রতার উপর অবিচলিত বিশ্বাস আছে। স্যামুয়েল স্মাইলসের ভাষায় বলা যায়, "শ্রম বোঝা ও

* What then Must we do? P. 340

শাসন হইতে পারে, কিন্তু তেমন আবার তাহা সম্মান ও গৌরবেরও।" Anarchist Communismএ প্রিন্স ক্রোপটকিন বলিয়াছেন, "আমাদের কাছে শ্রম একটি নেশা এবং আলস্য কৃত্রিমতা।"

অবসরের মোহ

অবসরের জন্য যে আন্দোলন তাহাকে এই কারণেই গান্ধীজি বিপজ্জনক ও কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন: "অবসর ভাল এবং কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজনও আছে। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, কায়িক শ্রমের দ্বারা সে আহার্য্য উৎপাদন করিবে। যাদুবিদ্যার মত আমাদের সকল প্রয়োজন এমন কি খাদ্য পর্য্যন্ত বিনাশ্রমে পাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।"* তিনি আরও বলেন: "আমেরিকা হইতে যদি কতিপয় কোটিপতি আসিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য পাঠাইয়া দিতে চায় এবং মানুষের উপকার ব্রতে উদ্দীপিত হইয়া আমাদের পরিশ্রম না করিতে অনুরোধ করে তাহা হইলে আমি সোজাসুজি ইহা প্রত্যাখ্যান করিব; কারণ ইহা আমাদের বাঁচিবার মূলনীতিতেই আঘাত করিবে।"† বার্ণার্ড শ' Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalismএ অবসর সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক উক্তি করিয়াছেন: "যাঁহারা জীবন একটি প্রকাণ্ড ছুটিতে পরিণত করিতে চান তাঁহারাও এই ছুটি হইতে মুক্তি চান। আলস্য এতই অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর যে অলস ধনীদের জগৎ অত্যন্ত ক্লান্তিকর নানা প্রকার বিচ্ছিন্ন

* Harijan 16. 5. 1936 † Harijan 7. 12. 1935

কাজে পূর্ণ।" শ আরও দেখাইয়াছেন যে ধনীদের অনন্ত অবসর আছে বটে কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া সব সময়েই কিছু না কিছু করিতেছে যাহাতে অলস জীবন যাপন করিবার জন্য শরীর সমর্থ থাকে।" শ'এর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তিনি বলিয়াছেন "নরকের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সংজ্ঞা হইতেছে অনন্ত অবসর।"

প্রকৃতপক্ষে শ্রম কেহ অপছন্দ করে না, অপছন্দ করে আধুনিক কারখানায় শ্রমিকের যে প্রাণহীন একঘেয়ে কঠোর শ্রম করিতে হয় তাহাকে। আধুনিক শ্রমে কোনও আনন্দ নাই, তাই অবসর সম্বন্ধে এত আন্দোলন। গান্ধীজির কাছে এই অবসরের মোহ একটি বিপজ্জনক নৈতিক ফাঁদ, কারণ অবসর সদ্ব্যবহারের সমস্যা অবসর লাভ করিবার সমস্যা অপেক্ষা অনেক গুরুতর। যথেষ্ট কাজ না থাকিলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অপচয়ের সৃষ্টি করিবে। তাই তিনি শ্বাসরুদ্ধকর স্নায়ুধ্বংসী সহরের দৈনিক কাজের পরিবর্ত্তে গ্রামের কুটীরের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে স্বাস্থ্যকর কাজের কথা বলেন।

গান্ধীজি যে কায়িকশ্রম শুধু নীতি ও মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে সমর্থন করেন না তাহা নহে। আর্থিক শোষণের মূল কারণে তিনি এইভাবে আঘাত করিতে চান যে যতদূর সম্ভব প্রত্যেকে নিজের অভাব নিজেই পূরণ করিবে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণ একে অপরের শ্রম অন্যায়ভাবে শোষণ করিতেছে। ফল হইতেছে একদিকে অলস বিত্তবানের সৃষ্টি যাহারা কায়িক শ্রম আদৌ করে না, এবং অপরদিকে ক্লান্ত শ্রমিকের দল, যাহারা অবসর যাচ্ঞা করিতেছে। আমরা যদি এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারি যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে শ্রম করে তাহা হইলে শোষণের পথ আর থাকিবে না এবং

দালাল সম্প্রদায় ক্রমে লোপ পাইবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের মত ব্যক্ত করিতে গিয়া গান্ধীজি বলেন, "আমার আহার্য্যের জন্য শ্রম করার প্রয়োজন নাই, তবু আমি সূতা কাটি কেন? এই প্রশ্ন হইতে পারে। যাহা আমার নিজের নয়, আমি তাহাই আহার করি, আমার দেশবাসীকে শোষণ করি। আপনার পকেটে যে মুদ্রাটি আসিতেছে তাহার উৎস সন্ধান করিয়া দেখুন আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।"*

উত্তরে হয়ত কেহ বলিতে পারে সমাজতন্ত্রে এই ধরণের শোষণের পথ নাই কাজেই আদিম অর্থনীতি-ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াও অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীকরণ অতিমাত্রায় এবং তাহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব করিয়া তোলে। তাহা ছাড়া রাশিয়ার মত সমাজতন্ত্রের পত্তন হিংসা ছাড়া সম্ভব নহে, গান্ধীজি হিংসা সমর্থন করিতে পারেন না। তাই গান্ধীজি বলেন, বিপুল উৎপাদনের পরিবর্ত্তে বিপুল জনগণ উৎপাদনে লাগিয়া যাউক। তিনি বলেন "আমার ব্যবস্থায় শ্রমই মুদ্রা, মুদ্রা কোন প্রকার ধাতু নহে।" "যে কেহ মুদ্রা হিসাবে শ্রমের ব্যবহার করিবে সে-ই ধনী হইবে। শ্রমকে মানুষ কাপড় বা শস্যে রূপান্তরিত করিতে পারে। নিজে যদি সে তেল উৎপাদন করিতে না পারে তবে প্রয়োজনীয় তেল সে উদ্বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে পাইতে পারে। ইহা স্বাধীন, সম্মানজনক ন্যায়ের ভিত্তিতে শ্রমের বিনিময় ও কাজেই তাহাতে অপহরণের কোনও প্রশ্ন উঠেনা। এই ব্যবস্থা এই বলিয়া আপত্তি করা যাইতে পারে যে

* Young India 1. 10. 1921

ইহাও আদিম বিনিময় ব্যবস্থা। কিন্তু সমগ্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি বিনিময় ব্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত নহে?"†

'খাদ্যের জন্য শ্রম' গান্ধীজির অন্যতম বিশ্বাস এবং তাঁহার কল্পনামত আদর্শ সমাজে প্রত্যেকের দিনে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিবার সুযোগ থাকিবে। আট ঘণ্টা নিদ্রা, আট ঘণ্টা কাজ ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে আর আট ঘণ্টা নিয়োগ তাঁহার মতে সময়ের আদর্শ ব্যবহার।

মানবতা

মূল্যের মান পরিবর্ত্তন করা গান্ধী-অর্থনীতির চতুর্থ সূত্র। নীতি ও মানবতার দিক বিবেচনা না করিয়া গোঁড়া অর্থনীতিতে টাকা ও বস্তুগত সমাজের উপরে জোর দেওয়া হয়। আমরা দেখিতেছি যে 'অর্থনৈতিক মানুষের অবসান' হইয়া আসিতেছে এবং অর্থনৈতিক মান পরিবর্ত্তন করা বিশেষরূপে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ সিসমোঁদির মত গান্ধীজিও নীতি হইতে অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করিতে চান না; জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে: "আমি স্বীকার করি যে আমি নীতি ও অর্থনীতির মধ্যে আদৌ সীমা রেখা টানিতে চাই না। যে অর্থনীতি ব্যক্তি অথবা জাতির নীতিগত স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে তাহা অন্যায় ও পাপ। যে অর্থনীতিতে এক দেশ অপর দেশকে শোষণ করিতে সহায়ক হয় তাহাও পাপ। কঠোর শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার পাপ। আমেরিকাতে উৎপন্ন গম ব্যবহার করিয়া আমার প্রতিবেশী শস্য

†Harijan 2. 11. 1934

বিক্রেতাকে গ্রাহক অভাবে মরিতে দেওয়াও পাপ। যখন দেখিতে পাই যে আমার প্রতিবেশী কাটুনী ও জোলার তৈয়ারী কাপড় ব্যবহার করিলে আমার বস্ত্র সমস্যা দূর হয়, তাহারাও খাইয়া পরিয়া বাঁচে, তখন আমার পক্ষে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ব্যবহারও পাপ।"*

"একটি শিল্পে অলস শেয়ার হোল্ডারদের কত লভ্যাংশ দেয় তাহা হইতে তাহার মূল্য বিচার না করিয়া এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের শরীর ও আত্মার উপরে তাহার প্রভাব কেমন তাহা দেখিয়াই শিল্পটির মূল্য বিচার করা উচিত। বোম্বাইয়ের অস্বাস্থ্যকর আবাসে যে সকল শ্রমিক বাস করে তাহাদের জীবনযাত্রা উপেক্ষা করিয়া গ্রাহককে যে কয়েক আনা পয়সা সস্তায় কাপড় দেওয়া হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ।"†

গান্ধীজির স্বদেশীর আদর্শ এই মানবতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। মানুষ সস্তায় ভাল জিনিষ কিনিবে, আধুনিক অর্থনীতির এই ব্যবস্থাকে তিনি অত্যন্ত অমানুষিক বলিয়া মনে করেন।

রাস্কিনও এই মতের অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন: "আমি যতদূর জানি ইতিহাসে মানুষের বুদ্ধির অসম্মানের ইহা অপেক্ষা অপর কোন বড় নজির নাই যে 'সস্তার বাজারে কিনিয়া চড়া দামে বিক্রয় করা'কেই জাতীয় অর্থনীতির আদর্শ বলিয়া ধরা হয়। সস্তা বাজারে কিনিবে? বেশ কথা, কিন্তু বাজার সস্তা হইল কেন? ঘর পুড়িয়া গেলে কাঠ কয়লা সস্তা হইবে, ভূমিকম্পের পর ইঁটের ছড়াছড়ি। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প জাতির পক্ষে লাভজনক নয়। চড়া দামে বিক্রয়

*Young India 13-10-1921. †Unto This Last

"কিনিতে চাও ? বেশ কথা, কিন্তু বাজার চড়া হইল কেন ? আজ তুমি বেশী দামে রুটি বিক্রয় করিয়াছ। সে কি মুমূর্ষু ব্যক্তি যে তাহার শেষ সম্বল দিয়া রুটি কিনিয়াছে, ভবিষ্যতে আর কখনই যাহার রুটির প্রয়োজন হইবে না ?"

পাশ্চাত্য জগতে টাকা ও লাভই নাকি চরম বিবেচ্য। তাহারই ফলে আমরা অসংযত অনুভূতিহীন শোষণ, করুণ বেকারসমস্যা ও কঠোর শ্রম দেখিতে পাই। অধ্যাপক কুমারাপ্পা সত্যই বলিয়াছেন, "ফ্যাক্টরীর শ্রমিকেরা টুকরা টুকরা হইয়া গেলেও সিকাগোর মাংস বোম্বাইয়ের কারখানার যন্ত্র একজন শ্রমিকের জীবন রক্ষা করিবার জন্য বন্ধ থাকিবে না।"†

গান্ধীজির কাছে 'মানুষই প্রধান বিবেচ্য' এবং 'জীবন টাকার চাইতে বড়।' "আমাদের বৃদ্ধ পিতামাতা কাজ করিতে পারে না, আমাদের সামান্য আয়ের পক্ষে তাঁহাদের মারিয়া ফেলা লাভজনক। ছেলেদের খাওয়াইয়া মানুষ করিতে হয়, পরিবর্তে কিছুই পাওয়া যায় না ; তাহাদেরও মারিয়া ফেলিলে লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমরা পিতামাতা অথবা ছেলেপিলেদের মারিয়া ফেলি না, বরং তাহাদের পালন করা সৌভাগ্য মনে করি, তাহার জন্য যতই কেন খরচ হউক না।"‡

আপনার অর্থনৈতিক আদর্শ বিবৃত করিতে গিয়া গান্ধীজি বলিয়াছেন, "খদ্দর-নীতি সাধারণ অর্থনীতি হইতে স্বতন্ত্র। শেষোক্তটি মানুষের কথা বিবেচনা করে না। প্রথমটির মানুষকে লইয়াই কারবার।"+ "খাদির অর্থ হইল পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সহৃদয়তা, যাহা কিছু

*Young India 6.4.22. †Why the village Movement, p. 10
‡Harijan 10-12-1938 +Harijan 16-7-1931

অপরের ক্ষতি করিবে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগই ইহার অর্থ।
*খাদি মানবতার পরিচায়ক, মিলের কাপড় ধাতুমূল্যের পরিচয় দেয়।†

'সারল্য, অহিংসা, শ্রমের পবিত্রতা ও মানবতা' এই চারিটি বিষয়ের উপর গান্ধীজির কেন্দ্রবিচ্যুত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আমি ভারতের অবস্থাতে এই কেন্দ্রচ্যুতির অর্থ কি এবং তাহাতে কি লাভালাভ হইতে পারে তাহা বিশ্লেষণ করিব।

গ্রাম্য কম্যুনিজম

স্মরণের অতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে গ্রাম্য সম্প্রদায় অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চলিত আছে। বলা হয়, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় রাজা পৃথু ইহা প্রবর্ত্তন করেন। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে ও মনুস্মৃতিতে গ্রামসঙ্ঘের উল্লেখ রহিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা রহিয়াছে। বাল্মিকীর রামায়ণে জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা বোধ হয় গ্রাম্য রাষ্ট্রের একটি সঙ্ঘ। ইহা নিশ্চিত যে গ্রীক আক্রমণের সময় উহা প্রচলিত ছিল; মেগাস্থানিস এই পঞ্চায়েতের (তিনি উহাকে পেণ্টাড আখ্যা দিয়াছেন) বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চু আঙ ও ফা হিয়েন বলিয়াছেন তাঁহাদের ভ্রমণ কালে ভারতে প্রভূত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত এবং লোক অতুলনীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস

*Young India 22-9-19 †Harijan 9-2-1934

কৌটিল্যের মধ্যযুগের গ্রামপঞ্চায়েতের স্বরূপ শুক্রাচার্য্যের নীতিসারে দেখিতে পাই।

ভারতের গ্রাম্য সম্প্রদায়

ভারতের গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি স্বাধীন ছোট ছোট রাষ্ট্র ছিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে এইগুলি প্রচলিত ছিল। রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের উত্থানপতন সত্ত্বেও তাহা বাঁচিয়া ছিল। Committe of Secrecy of the East India Company ১৮১২ সালের রিপোর্টে বলিয়াছে; "সরল মিউনিসিপাল শাসনে এই সকল সম্প্রদায় স্মরণের অতীত কাল হইতে রহিয়াছে।......অধিবাসীরা রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া আমলেই আনে না গ্রাম অবিচ্ছিন্ন থাকিলে তাহা কোন রাজত্বের অধীনে গেল বা না গেল তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না, ইহার আভ্যন্তরীন অর্থনীতিও অবিকৃত থাকে।" স্যার চার্লস মেটকফ্ বলিয়াছেন "একের পর একটি বিজেতা ভারতে আসিয়াছে কিন্তু এই সব গ্রাম্য সম্প্রদায় কুশঘাসের মত গ্রামের মাটিতে মূল গাড়িয়া রহিয়া গিয়াছে।" ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে তদানীন্তন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল এই সকল গ্রাম্যসম্প্রদায়ের বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এইগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের মত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বৈদেশিক প্রভাব হইতেও সম্পূর্ণ মুক্ত।

"যেখানে কিছুরই স্থায়িত্ব নাই সেখানে এগুলি বেশ টিকিয়া আছে। ...এই গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। আমার মনে হয় ভারতের অসংখ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে জনগণকে বাঁচাইয়া রাখিতে

ইহাই সর্ব্বাধিক সাহায্য করিয়াছে এবং ইহাই জনগণের স্বচ্ছন্দ ... দিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। অতএব আমার মনে হয় গ্রাম্য সংগঠন একটুও বিক্ষুব্ধ করা উচিত নহে। যাহা কিছু এই বিষয়টি ভাঙিতে চায় আমি তাহা ভয়াবহ বলিয়া মনে করি।"

কিন্তু তাহা হইবার উপায় ছিল না। ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার প্রবল ইচ্ছাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সহিত ব্যবস্থা করিবার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক চাষীর সহিত ব্যবস্থা করিতে চাহিল। বিচার ও শাসনের সমস্ত ক্ষমতা হাতে লইবার জন্য বৃটিশ শাসকেরা গ্রামের সঙ্ঘগুলিকে অকেজো করিয়া স্মরণাতীত কালের ক্ষমতা হরণ করিল। এই সকল রাষ্ট্র ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল। রমেশচন্দ্র দত্ত Economic History of India তে বলিয়াছেন "বৃটিশ শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখময় ফল হইল ভারতে যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছিল তাহা বিলোপ করা।"

ভারতের গ্রাম্য রাষ্ট্রগুলির বিষয় কার্ল মার্ক্সের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছিল। Das Capital-এ তিনি লিখিয়াছেন, "ক্ষুদ্র ও অতি প্রাচীন ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি, যাহার কিছু কিছু অস্তিত্ব এখনও আছে, ভূমির যৌথ মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত। একপ্রকার শ্রমবিভাগ করিয়া কৃষি ও কারিকরদের প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করা হয়; নূতন সম্প্রদায় উদ্ভূত হইলেও এই নিয়ম কঠোরভাবে মানিয়া চলে। উৎপাদনের দিক হইতে প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, যে ভূমি হইতে উৎপন্ন সংগ্রহ করা হয় তাহা একশত হইতে কয়েক সহস্র একর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উৎপন্ন দ্রব্য সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই, বিক্রয়ার্থ পণ্য নহে। পণ্য বিনিময়ের জন্য যে শ্রমবিভাগ ভারতের এই সম্প্রদায়-

সুদ্দিতেও দেখা দিয়াছে, উৎপাদনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের এই ধরণের সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সরল সম্প্রদায়ে সকলে মিলিয়া চাষ করে এবং প্রত্যেক পরিবার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সূতাকাটা ও কাপড়বোনা প্রভৃতির কাজ করে। এই সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সরল উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে আমরা এসিয়ার সামাজিক অপরিবর্ত্তনীয়তা বুঝিতে পারি। ইহা এসিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজবংশের উত্থানপতনের সহিত একেবারেই মেলে না। রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটাতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো আদৌ বদলায় না।"

Village Communitis : in the East and West নামক পুস্তকে স্যার হেনরি মেইন বলিয়াছেন যে "ভারতের গ্রাম্য সম্প্রদায় অত্যন্ত সজীব প্রতিষ্ঠান ছিল," এবং "ভারতের ও ইয়োরোপের গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি কার্য্যত একই ধরণের ছিল।" স্যার হেনরি বলেন "ইংলণ্ড হইতে প্রথমে যে দিন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায় তাহারাও চাষবাসের জন্য গ্রাম্যসম্প্রদায় রূপ সংগঠিত হয়।" প্রিন্স ক্রোপটকিন তাঁহার বিখ্যাত Mutual Aid নামক গ্রন্থে রাশিয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও সুইজারলণ্ডের এই সম্প্রদায়গুলির ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সঙ্ঘগুলি স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে অদৃশ্য হয় নাই, স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়া এইগুলির উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে, "যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মরণ আখ্যা দিবার মতই এই সঙ্ঘগুলির স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে বলা অত্যন্ত হাস্যকর।" প্রিন্স ক্রোপটকিনের এই উক্তি

আমাদের দেশে যে অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য তাহা ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে।

ভারতের গ্রামগুলি অর্থনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও টোটালিটেরিয়ান নিয়ন্ত্রণের চরম দিকগুলি বিসর্জ্জন দিয়া একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক সমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহারা কৃষি ও শিল্পে একটি আদর্শ সমবায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল যাহাতে ধনীর পক্ষে দরিদ্রকে শোষণ করিবার কোন পথ ছিল না। গান্ধীজি বলিয়াছেন "উৎপাদন, গ্রহণ ও বণ্টন প্রায় সমসাময়িক ছিল"। 'অর্থ-বিনিময়ে'র একেবারেই অস্তিত্ব ছিল না। সদ্য ব্যবহারের জন্যই উৎপাদন, ভবিষ্যত বাজারে বিক্রয়ের জন্য নহে। অহিংসা ও পরস্পরের প্রীতির উপরেই সমাজের ভিত্তি ছিল। এই জন্য গান্ধীজি গ্রাম্য সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ভব প্রচার করিতেছেন যেখানে সম্পন্ন কৃষি, রুচিসম্পন্ন ও কেন্দ্রচ্যুত শিল্প এবং ছোট ছোট সমবায় সঙ্ঘ থাকিবে।

আদর্শ গণতন্ত্র

রাজনৈতিক গঠনের দিক হইতে এই গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলিই ছিল আদর্শ গণতান্ত্রিক। জন স্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছেন, "যে শাসনে সমস্ত লোকে অংশ গ্রহণ করে তাহাতেই সমাজ-রাষ্ট্রের সকল লক্ষণ বিদ্যমান।" ইয়োরোপে গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিতে এই প্রকৃত গণতন্ত্রের লক্ষণ অনেকাংশে দেখা গিয়াছে, কারণ সেখানে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নাগরিকদের হাতে ছিল। লর্ড ব্রাইস্ বলিয়াছেন "এই প্রতিষ্ঠানকে

একত্রে আইন ও শাসন পরিষদ বলা যাইতে পারে, ইহাতে শাসন, আইন ও বিচার তিনটি অঙ্গই মিলিত হইয়াছে।” “গ্রীক রাষ্ট্রে, ক্ষুদ্র আকারের জন্যই, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সকলের পক্ষে শুনিতে পাওয়া সম্ভব ছিল; সকলেই গণপরিষদে ভোট দিবার অধিকারী; যাহারা শাসন অথবা নেতৃত্ব অভিলাষী তাহাদের চারিত্রিক গুণাগুণও সকলের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব হইত।”* গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মত ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের আভ্যন্তরীণ শাসন সহজে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চালাইতে পারিত কারণ “সাধারণের বিষয় সাধারণদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত।” অবিচার অথবা প্রবঞ্চনার কোনও পথই সেখানে ছিল না। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইবার কারণ বড় বড় নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা প্রায় অসম্ভব, নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে সংযোগের অভাবও অন্যতম কারণ। আধুনিক গণতন্ত্রের সংস্কার-সমস্যার সকল সমাধানই সেইজন্য কেন্দ্র-বিচ্যুতির দিকে জোর দিতেছে। সিণ্ডিকালিজম, গিল্ড সোশ্যালিজম, এনার্কিজম, অপর যে কোনও বিষয়েই স্বতন্ত্র হউক না কেন, ছোট ছোট সঙ্ঘ গঠন ব্যাপারে সব কয়টিই একমত। প্রফেসর জোঅড বলেন “সামাজিক কর্ম্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে রাষ্ট্র অধিকার খর্ব্ব করিয়া তাহা ছড়াইয়া দিতে হইবে। এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে তাহার উৎপাদন ও শাসন ব্যবস্থায় আপনার মতামত ব্যক্ত করিতে পারে এবং সে যে রাজনৈতিক দিক হইতে প্রয়োজনীয়, তাহার ইচ্ছার একটি মূল্য আছে এবং তাহার কাজ সামাজিক প্রয়োজনে নিযুক্ত হইতেছে—এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে

*Modern Democracies, p. 187.

তাহার সে কথাও একবার মনে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রিক যন্ত্রটি ক্ষুদ্র করিতে হইবে ; শাসন ব্যবস্থা স্থানীয় হইলে তাহা পরিচালনা সহজ হইবে এবং নিজেদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিলে মানুষকে অনুভব করানো সম্ভব যে, যদি শাসন ব্যাপারটি সত্যই বাস্তব হয় তবে সমাজ তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইবে, কারণ তাহারাই সমাজ।"*

ডাঃ বুডিনও মনে করেন যে "ছোট ছোট সুসংহত রাষ্ট্রই সভ্যতার নৈতিক ভিত্তি।"‡

যান্ত্রিকতার কুফল

গণতন্ত্রের কথা ছাড়াও গান্ধীজি যে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের কথা বলেন তাহার কারণ তিনি অধিকমাত্রায় যান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের বিরোধী। তিনি মনে করেন যন্ত্র মানুষকেও যন্ত্রে পরিণত করিয়া তাহার সুকুমার বৃত্তিগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অত্যধিক যন্ত্র-ব্যবহারের বিরোধী গান্ধীজি একা নহেন। আদম স্মিথ আধুনিক রাষ্ট্রিয় অর্থনীতির জনক। তিনি শ্রমবিভাগ সমর্থন করিলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, যে একটি লোকের যদি চিরজীবন শুধু একটা কাজ করিয়া কাটে তাহা হইলে "সে মূর্খ ও বোকাতে পরিণত হইতে বাধ্য।" "তাহার একঘেয়ে জীবনের পুনরাবর্ত্তন তাহার মনের সাহস নষ্ট করে। একই বিষয়ে কাজ করিয়া সে বুদ্ধিগত, সামাজিক ও সামরিক গুণের বিনিময়ে সেই বিষয়ে কর্ম্মকুশলতা অর্জ্জন

*Modern Political Theory, p. 120-21. ‡Social Psychology-F.H. Allport.

করে।"* ডেভিড রিকার্ডোও বিশ্বাস করিতেন যে "মানুষের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের ব্যবহার শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।" "এই মত কোনও ভ্রান্ত সংস্কারজাত নহে, অর্থনীতির সঠিক সূত্রদ্বারাই এই মত সমর্থিত।"‡ কার্ল মার্ক্স বলেন "অত্যধিক যন্ত্রের ব্যবহারে ও শ্রম বিভাগের ফলে সর্ব্বহারা শ্রেণী তাহাদের চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং শ্রমিকেরও তাহার কাজের প্রতি সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণ নষ্ট হইয়াছে।" "সে যন্ত্রের একটি অংশ মাত্রে পরিণত…"† Das Capital এ মার্ক্স বলিয়াছেন যে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় "শ্রমিক পঙ্গু দানবে পরিণত হইতেছে।" অপরদিকে "স্বাধীন কৃষক ও কারিগর ক্রমশ জ্ঞানে, অন্তর্দৃষ্টিতে ও মনের জোরে উন্নত হইয়া উঠে।" প্রিন্স ক্রোপটকিন বলেন "কুশলী কারিগর প্রাচীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে এবং প্রায় বিলীন হইয়া আসিতেছে।" "হাতের কাজ করিয়া যে কুশল-কর্ম্মী আনন্দ লাভ করিত তাহার পরিবর্ত্তে লৌহ দানবের দাস হিসাবে মানুষকে নিয়োগ করা হইতেছে।"§ মেরি সাদারল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন "আধুনিক ফ্যাক্টরীর কাজ সৃজনীশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে, অবসর সময়ে কলের আমোদ ব্যবস্থা উপভোগ করিবার মত শক্তি থাকে মাত্র।" "কারখানার আবহাওয়া মাত্র তাহার জন্য দায়ী নহে, সেখানকার অধিকাংশ কাজের প্রকৃতিই এইরূপ।"ꟻ

আদম স্মিথের সময় হইতে সমসাময়িক কাল পর্য্যন্ত পিন তৈয়ারীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism গ্রন্থে বার্নার্ড শ বলিয়াছেন, বলা হয় মানুষ দিনে পাঁচ হাজার পিন তৈয়ারী করিতে পারে কাজেই

*Wealth of Nations ‡Principles of Political Economy
†Comunist manifesto §Fields, Factories & Workshop
ꟻVictory or Vested Interest

পিনের প্রাচুর্য্যবশত তাহা সস্তা হইল। দেশের তাহাতে সম্পদ বৃদ্ধি হইল, কেননা অনেক পিন পাওয়া যাইতেছে ; যদিও পিন তৈয়ারীর কাজে সক্ষম মানুষ যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইতেছে এবং ধনিকের উদ্বৃত্ত খাদ্য তাহাকে দেওয়া হইতেছে। যন্ত্রে যেমন তেল ও কয়লা [illegible] হয়, এই খাদ্যও ঠিক সেই জন্যই দেওয়া, কবি গোল্ডস্মিথ দূরদর্শী অর্থনীতিবিদও ছিলেন, তিনি তাই বলিয়াছেন 'সম্পদ বাড়িয়া উঠে আর মানুষ ক্ষয় হয়।'

অধ্যাপক শিল্ড তাঁহার Evolution of Industrial Organisation বইএ প্রমাণ করিয়াছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন-ব্যবস্থায় "কুশলতা উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আছে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত গতি বন্ধ অথবা শ্রমিকেরা যাহাতে অবসন্ন হইয়া না পড়ে তেমন কিছু করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই।" "একটি বিষয়ে কুশলী করিবার প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শ্রমিকের চিন্তা, কাজ আরম্ভ করিবার সাহস এবং কাজ হইতে আনন্দ পাইবার ক্ষমতা নষ্ট হইতেছে।" মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে আর্নেস্ট হার্স্ট বলেন "উৎপাদন শক্তি এত আশ্চর্য্যরকম বাড়িয়া উঠিতেছে যে শ্রমিকেরা প্রাণহীন যন্ত্রের অংশে পরিণত হইতেছে। কাজের মধ্যে যে সৃজনী শক্তি প্রকাশ পাইবার সুযোগ ছিল তাহার ফলে অতীতে কারিগর কাজ হইতে আনন্দ পাইত। কাজ করিত নিজের বাড়ীতে অথবা কারখানায়। কিন্তু এখনকার ফ্যাক্টরীর সে একটি তুচ্ছ অঙ্গ মাত্র, তাহার নামও বোধ হয় সেখানে কেউ জানে না, শুধু নম্বরেই সে পরিচিত।"

আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় এই সকল ত্রুটি সহজাত। শুধু সমাজতন্ত্রেই তাহা দূর হইবে না। এই সকল ত্রুটির কথা কার্লমার্ক্স ভাল করিয়াই জানিতেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল সাম্যবাদী রাষ্ট্রে তাহা দূর হইবে।

ধনিক অথবা সমাজতান্ত্রিক যে কোন রাষ্ট্রেই হউক না কেন অত্যধিক যন্ত্র ব্যবহারে তাহার ফলে শ্রমিকের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই। 'This Ugly Civilization' নামক গ্রন্থে বোরসোডি লিখিয়াছেন, ব্যক্তিগত মালিকানা রহিত করিয়া শোষণ বন্ধ করিলেই বিপত্তির মূলে পৌছান যায় না। ফ্যাক্টরীর অপরিবর্ত্তনের ত্রুটি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হইবেই। ফ্যাক্টরী সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করিতে বহু আদর্শবাদী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ঈপ্সিত পূর্ণ ফল কিছুতেই লাভ হইবে না। সমাজতন্ত্রে ফল পাওয়া যাইবে না কারণ ফ্যাক্টরী মানবসমাজে যে রোগ সৃষ্টি করিয়াছে, সমাজতন্ত্রে তাহার মূল স্পর্শ করে না। কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি জনিত যে রোগ মানব সমাজে দেখা দিয়াছে তাহার মূল স্পর্শ করিতে অক্ষম বলিয়া সমাজতন্ত্রবাদ ব্যর্থ হইবে।"

মহাত্মা গান্ধীও এই মত পোষণ করেন। "পণ্ডিত নেহেরু শিল্পের প্রসার চান, কারণ শিল্প সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হইলে পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলি তাহাতে থাকিবে না। আমার মনে হয় শিল্পপ্রসারের সহজাত কতগুলি দোষ আছে যাহা সমাজতন্ত্র দ্বারা দূর হইবার নহে।" *

যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীজির মনোভাব

ইহা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার যে গান্ধীজি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বিরোধী নহেন। "যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। চরকাও ত একটি

* Harijan 29-9-1940.

মূল্যবান যন্ত্র।" তাঁহার আপত্তি "যন্ত্রোন্মাদনায়" এবং "যন্ত্র প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধিতে।" কাজেই তিনি যন্ত্র দূর করিতে চান না, তিনি চান যন্ত্রের ক্ষমতা কমাইয়া দিতে। "কোটি কোটি কুটিরবাসীর ভার লাঘব করিতে" তিনি যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু যে যন্ত্রের প্রয়োগে মানুষকে যান্ত্রিক কলের পুতুলে পরিণত করে অথবা শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত করে তিনি তাহার বিরোধী। "যে কাজ করিবার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না তাহার জন্য যন্ত্র কার্য্যকরী। কিন্তু যেখানে কাজ করিতে ইচ্ছুক বহু লোক আছে, যেমন ভারতবর্ষে, সেখানে যন্ত্র প্রয়োগ দোষের। আমাদের গ্রামের অসংখ্য লোককে কি করিয়া অবসর দিতে পারিব আমাদের সমস্যা তাহা নহে। আমাদের সমস্যা তাহারা বছরের ছয় মাস যে আলস্যে কাটায় ঐ সময়ে তাহাদের কি কাজ দিব।"* তিনি বলেন ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি প্রাণবান গ্রামবাসীরাই ত যন্ত্র, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রাণহীন যন্ত্রের প্রয়োগ উচিত নহে।" যে যন্ত্র 'বহুকে বঞ্চিত করিয়া কয়েকজনকে ধনী করিয়া তোলে' তাহা তিনি চান না।

গান্ধীজি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন অথবা যন্ত্রের উন্নতির বিরোধী নহেন। 'যাহা প্রত্যেকের উপকারে আসিবে এমন সব উদ্ভাবনই আমি সমর্থন করি। ছোট ছোট যে সকল যন্ত্র কুটীর-শিল্পের সহায়ক এবং যাহা লোকে অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারে, অথচ যন্ত্রের দাস হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সে সকল যন্ত্রের উন্নতি নিশ্চয়ই মঙ্গলকর। 'শ্রম বাঁচাইবার জন্য যে যন্ত্র উদ্ভাবনের পাগলামি' দেখা দিয়াছে তিনি তাহা ভাল চোখে দেখেন না।

* Harijan 16-11-1934

"শ্রম বাঁচাইবার উদ্ভাবন নিরবচ্ছিন্ন চলিতে থাকে, এদিকে লোকে কর্ম্মহীন হইয়া পথের উপরে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি সময় ও শ্রম সকলের জন্যই বাঁচাইতে চাই কিন্তু মানুষের একাংশের জন্য নহে। সম্পদ পুঞ্জীভূত হউক—ইহা আমি চাই, কিন্তু তাহা কয়েকজনের হাতে জমা না হইয়া সকলের হাতে হউক। আজ যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন কোটী কোটী লোকের পিঠে চাপিয়া বসিয়াছে। শ্রম বাঁচাইবার মানবহিতকর চেষ্টা তাহার জন্য দায়ী নহে, দায়ী লোভ। এই যে পরিবেশ আমি তাহার বিরুদ্ধে প্রাণপনে লড়িতেছি।"*

বেকার সমস্যা

ইউরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্র প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়াছিল কারণ সে দেশে টাকা ছিল অনেক অথচ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কম। স্বাভাবিক সম্পদ পূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদের যন্ত্রের সাহায্য লইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের অবস্থা পাশ্চাত্যের ঠিক বিপরীত। এখানে টাকা নাই, লোক আছে। আমাদের সমস্যা শ্রম বাঁচাইবার উদ্ভাবন নহে, সমস্যা হইতেছে যাহারা বাধ্য হইয়া অলস জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের কাজ দেওয়া। পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্র ন্যায়সঙ্গত সীমা ছাড়াইয়া গিয়া প্রয়োজনের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। এখন তাহা শঙ্কার ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ হারাইয়া আত্মঅবমাননাকর দান লইতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষে যতটা কল্পনা করিতে পারে আমেরিকায়

* Young India 13-11-1924

যন্ত্রের ব্যবহার ততদূর। একা আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা পৃথিবীর আরও চৌদ্দটী অগ্রসর জাতির একত্রিত উৎপাদন ক্ষমতার সমান। ভারতবর্ষের মাথা পিছু যাহা উৎপাদন হয় আমেরিকাতে হয় তাহার পঁচিশ গুণ। তথাপি আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার। শিল্পে অগ্রসর অন্যান্য দেশের অবস্থাও একইরূপ। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের ১৯৩৯-৪০ সালের Statistical Year Book হইতে আমি নিম্নলিখিত বেকারের হিসাব উদ্ধৃত করিতেছি:

	১৯৩৫	১৯৩৯
আমেরিকা	৭.৪৫০.০০০	৬.২৪০.০০০
ইংলণ্ড	১.৭৩০.১৯৪	১.২৯৮.৮০১
জার্ম্মাণী	৩৪৮.৬৭৫	২৮৪.১৩২
ফ্রান্স	৪.৬৫.৮৭৫	৪০৪.৬০৪
জাপান	৩.৫৬.০৪৪	২.৩৭.৩৭১

ভারতবর্ষের ১৯৩১ সালের জনগণনায় দেখা যায় যে অন্তত দুই কোটি লোক বেকার। জমি নাই অথবা লাভজনক জমি নাই এমন জমির মালিক লক্ষ লক্ষ লোক আংশিক বেকার। পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতবর্ষের শতকরা ৫০জনই বেকার বলিয়া ধরিতে হয়। একথা সকলেই জানে যে আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ কৃষিকর্ম্ম করে। যে দশ ভাগ শিল্পে নিয়োজিত তাহারও মাত্র বিশলক্ষ লোক বড় কারখানায় কাজ করে। দেশের সকলপ্রকার চাহিদা মিটাইবার জন্য যদি শিল্প আরও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলেও মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ জনের কাজ যোগাইতে পারিবে না।

ছোট ছোট কুটীর শিল্পে নিযুক্ত লোক-সংখ্যার পরিমাণ বড় বড়

কারখানার পাঁচ গুণ। ডাঃ ভি. কে. আর. ভি রাও নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন :

বড় কারখানায় নিয়োজিত কর্ম্মী সংখ্যা	১,৪৮২	হাজার
ছোট " " "	২২৮	"
কুটীর শিল্পে " "	৬,১৪১	"

এই প্রসঙ্গে খদ্দর ও বয়নশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা তুলনা করা যাইতে পারে। ১৯৪৩-৪৪ সালের Year Book এর হিসাব মত বৃটীশ ভারত ও করদ রাজ্যগুলিতে নিয়োজিত দৈনিক কর্ম্মী সংখ্যা ১৯৪০ সালে ছিল ৪,৩০,১৬৫। নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের হিসাব মত তাহাদের নিজেদের সঙ্ঘের অধীন কর্ম্মী ঐ বছরে ছিল ২৬৯,৪৪৫। ইহা ছাড়া আরও এক কোটির মত তাঁতি আছে। গত তিরিশ বছরে ফ্যাক্টরী প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পাইলেও মোট নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার হার ক্রমশই কমিতেছে :

১৯১১—৫·৫	শতকরা
১৯২১—৪·৯	"
১৯৩১—৪·৩	"
১৯৪১—৪·২	"

এই হিসাব হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক কোনও প্রকার শিল্পপ্রসারেই বেকার সমস্যা দূর হইবার নহে। এই কারণেই গান্ধী পাশ্চাত্যের অনুকরণে কোনও প্রকার পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে রাজী নহেন।

বণ্টন সমস্যা

বেকার সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও গান্ধীজি বণ্টন ব্যবস্থার জন্যও কুটীর শিল্পের পক্ষপাতী। "যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে যন্ত্রের ব্যবহারে মানুষের সকল প্রয়োজন মিটিতে পারে তথাপি একথা স্বীকার্য্য তাহার ফলে দেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে উৎপাদনের প্রাচুর্য্য সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে আবার বণ্টন সমস্যা বাঁকা পথে দেখা দিতে পারে। কিন্তু যেখানে যাহা প্রয়োজন সেইখানেই যদি তাহা উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে বণ্টন ব্যবস্থা সরল হইয়া পড়ে এবং তাহাতে প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা কম থাকে, দালালির ত পথই থাকে না।"* গান্ধীজি বলেন "একই সময়ে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সামঞ্জস্য বজায় থাকে।"

গান্ধীজি সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থাও ভাল মনে করেন না। "সোভিয়েট রাশিয়ার যেমন উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় সেই ধরণের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমার মতামত কি তাহা অনেকে জানিতে চাহেন। ইহা একটি নূতন পরীক্ষা মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত এই পরীক্ষা সফল হইবে আমি বলিতে পারি না। যদি এই ব্যবস্থার পিছনে বলপ্রয়োগ না করা হইত তাহা হইলে আমি ইহা অত্যন্ত ভালবাসিতাম। কিন্তু ইহার ভিত্তি বলপ্রয়োগে, কাজেই জানি কোথায় কতদূরে ইহা আমাদের লইয়া যাইবে।"†

একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলিয়াছেন "প্রভূত যন্ত্রের প্রয়োগে

* Harijan 2-11-1934 † Harijan 2-11-1934

'যদি ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে তবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও একচেটিয়া ব্যবসা গড়িয়া উঠে, সাধারণ যদি তাহার মালিক হয় তাহা হইলেও এক বিরাট দৈত্যের সৃষ্টি হইবে যাহার শক্তির অপব্যবহার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।" তাহা ছাড়া রাশিয়ার জটিল বণ্টন ব্যবস্থা গান্ধীজি পছন্দ করেন না! কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টনের ফলে ম্যানেজারি আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে কয়েকজনের হাতে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এই কারণেই গান্ধীজি বড় বড় কারখানায় প্রভূত উৎপাদনের পরিবর্তে প্রভূত জনগণদ্বারা ছোট কেন্দ্রচ্যুত কারখানায় উৎপাদন পছন্দ করেন। খদ্দর উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ইহাকেও প্রচুর উৎপাদন বলা যায়। কিন্তু এই উৎপাদনের প্রাচুর্য্য হইতেছে জনগণের ঘরে। প্রত্যেকের উৎপাদন মাল লক্ষগুণ করিলে প্রচুর উৎপাদন হইবে না কি? আমি জানি তোমরা উৎপাদনের প্রাচুর্য্য অর্থে বোঝ, জটিল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সামান্য কয়েকজনের কাজে যাহা উৎপন্ন হয়। আমি বলি তাহা ভুল। আমি যে যন্ত্র চাই তাহা অত্যন্ত সরল, যাহা কোটি কোটি লোকের ঘরে বসানো যায়।"*

জাতীয় নিরাপত্তা

জাতীয় আত্মরক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণের দিক হইতে দেখিলেও শিল্পের কেন্দ্রবিচ্যুতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। কেন্দ্রীভূত শিল্পের উপরে লক্ষ্য করিয়া অনায়াসেই বোমা ফেলা যায়, কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র

*Harijan 2-11-1934

ধ্বংস করিতে পারিলে সামরিক শক্তি শুধু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না, দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই গ্রেট বৃটেন, জার্ম্মানী ও জাপান তাহাদের শিল্প কেন্দ্রচ্যুত করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে। জাপানের অসীম ক্ষমতার বিরুদ্ধে চীনের সাফল্যের কারণ সে দেশের চমৎকার শিল্প সমবায়গুলি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনায় অন্যদেশের মত ভুল করা কি বোকামি নহে? বোম্বাই ও আমেদাবাদের মত বড় বড় সহরে বয়ন শিল্পগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিয়া গ্রামে গ্রামে খদ্দর তৈয়ারীকে উৎসাহ দেওয়া কি বেশী ভাল নহে? গান্ধীজি লিখিয়াছেন :

"দেশের কোটি কোটি লোক ১৯০০ মাইল লম্বা ও ১৫০০ মাইল প্রশস্ত দেশের গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান যদি করে তবে তাহা সব সময়েই ভাল ও নিরাপদ। জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যদি নিজেরাই উৎপাদন না করে তাহা হইলে স্মরণাতীত কাল হইতে যে স্বাধীনতা এইসকল গ্রাম ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না।*

উৎপাদনের ব্যয়

যাঁহারা শিল্প-প্রসারের সপক্ষে তাঁহারা বলেন মিলে তৈয়ারী জিনিষ উৎপাদনের খরচ কম বলিয়া হাতে তৈয়ারী জিনিষের চাইতে

*Young India 2-7-1931

মূল্য। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই বিষয়ে ডাঃ জ্ঞানচাঁদ একটি চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন, ব্যয় সম্বন্ধে এই যুক্তির পিছনে যে কতকগুলি বিষয় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ভুল এবং মূল্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উপরেই ইহার ভিত্তি, কারণ সামাজিক দিক হইতে দেখিলে শিল্প প্রসার অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। শিল্প প্রসারের ফলে নোংরা বস্তি এবং কারখানার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি ত হয়ই, উপরন্তু ইহার ফলে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হয় যাহাতে সমাজের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে, সামাজিক সাম্য নষ্ট হইয়া অত্যন্ত অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। ফ্যাক্টরীজাত দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারণ করিবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার। এই ব্যয় শিল্পপতিদের ব্যক্তিগতভাবে বহন করিতে হয় না বটে, কিন্তু সমাজকে এই ব্যয়ভার সহ্য করিতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "অর্থনৈতিক কারণেই যুদ্ধ বাধিয়া থাকে, কাজেই যুদ্ধের জন্য যে বিপুল অর্থ ও লোকক্ষয় হয় তাহাও ফ্যাক্টরী হইতে উৎপন্ন দ্রব্য মূল্যের ভিতরেই ধরা উচিত।" মধ্য প্রদেশ ও বেরারের Industrial Survey Commission এর রিপোর্টে অধ্যাপক কুমারাপ্পা লিখিয়াছেন, "বড় বড় কেন্দ্রীভূত শিল্পের জন্য দেশ দেশান্তর হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া স্থান বিশেষে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই জন্য যান-বাহন ও কাঁচা মাল উৎপাদন কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ইহার ফলে অপরের কাজও জীবনযাত্রার উপরে বিস্তৃত হয় বলিয়া তাহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এই ধরণের ক্ষমতা ছাড়া বহু পরিমাণ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্ভব নহে।......এই জন্য বড় বড় শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য যদি সস্তা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশের সাধারণ আয় হইতে এই ধরণের উৎপাদনের কিছু কিছু ব্যয়

পরোক্ষে হইয়া থাকে। অতএব বৃহৎ শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য সস্তা বলিয়া যুক্তি দেখানো ভুল।” এই কারণেই গান্ধীজি বয়ন শিল্পের উদাহরণ দিয়া বলেন “এক গজ মিলের কাপড় এক গজ খদ্দর হইতে সস্তা বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে এবং গ্রামবাসীদের কথা বিবেচনা করিলে খাদি ঐ সস্তা ও বাস্তব যাহার কোনই তুলনা হয় না।”* তেমনি ঢেঁকি ছাঁটা চাউল কলের চাউল অপেক্ষা দাম বেশী, কিন্তু কলের চাউলে দেশের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাহা বিবেচনা করিলে ঢেঁকিছাঁটা চাউল মহার্ঘ্য বলিয়া মনে হইবে না। ঘানি ও কলের তেল সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। বড় বড় কারখানায় ব্যয় সংক্ষেপ হইবার অন্যতম কারণ কেবলমাত্র একটি বিশেষ স্থানে—ঐ শিল্পের সমাবেশেই নহে। বহু পরিমাণে কাঁচামাল কেনা, একসঙ্গে তৈরী মাল বেচা, মূলধনের সুবিধা, রেলের কম ভাড়া, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রভৃতিও এই ব্যয়সংক্ষেপের কারণ; এইগুলি কুটীর শিল্পে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক যদি কুটীর-শিল্প বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত হয় তাহা হইলে কুটীরজাত পণ্য কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত সহযোগিতায় না পারিবার কোন কারণ নাই। ঘরে ঘরে যন্ত্রচালিত তাঁত প্রচলনে যে কি সুবিধা হইতে পারে তাহা প্রথম বয়নশিল্প সম্মেলনের অধিবেশনে স্যার ভিক্টর সাসুন বলিয়াছেন। তিনি বলেন “এদেশে হালকা মোটরচালিত তাঁত প্রস্তুত করিবার বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে; অল্প পুঁজির মালিক অনায়াসেই এই তাঁত কিনিতে পারে।…এই ধরণের ছোট যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যে ভারতবর্ষ গুণের ও মূল্যের দিক হইতে যে কোন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

*Harijan 20-6-1936

বিশেষ করিয়া যদি এই ধরণের কাজ সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়।”

স্যার” ভিক্টর পুঁজিবাদের ভিত্তিতেই এই কেন্দ্র-বিচ্যুতি কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা কাম্য নহে। চীন দেশের মত এই সব স্বাধীন ছোট ছোট শিল্পের সমবায় গড়িয়া তোলা যায়। কিন্তু স্যার ভিক্টর এই ধরণের পণ্যের গুণ ও মূল্য সম্বন্ধে বড় কারখানার মূল্যের তুলনার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি স্যার হেনরি ফোর্ডও স্বীকার করিয়াছেন বড় বড় কারখানা মাত্রেই ব্যায় সংক্ষেপ হয় না। “সাধারণের সেবাই উদ্দেশ্য এই কথা স্মরণ রাখিয়া বড় বড় ব্যবসা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া থাকা উচিত; তাহার ফলে শুধু যে ব্যায় সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে তাহা নহে, লোকে যে পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের মধ্যেই উৎপাদন লব্ধ অর্থ ব্যয় করা উচিত।”* সমস্যাটির যান্ত্রিক দিক সম্বন্ধে রিচার্ড গ্রেগ তাঁহার Economics of Khaddar নামক গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন।

জীববিজ্ঞানের সাক্ষ্য

জীববিজ্ঞানের দিক হইতেও গ্রাম্য সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবন কাম্য। ম্যালথাস জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির আশঙ্কা করিতেন, আধুনিক জীববৈজ্ঞানিক ও সমাজতান্ত্রিকেরা মানুষের নিঃশেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা

* My life and Work

লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, কারণ গত কয়েক দশকে বিভিন্ন দেশে লোক সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। সমাজতত্ত্বের একটি অলঙ্ঘ্য নীতি এই যে সহরের বড়লোক অপেক্ষা গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে জন্মের হার অনেক বেশী। এমন কি আদম স্মিথ Wealth of Nations এ লিখিয়াছেন যে "স্ত্রীজাতির বিলাসিতা সম্ভোগেচ্ছা হয়ত বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহা সন্তানধারণ ক্ষমতা কমাইয়া ফেলে, এমনকি অনেক সময়ে নষ্ট করিয়া দেয়।" নানা কারণেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রধান কারণ এই ঃ সহরের জনবাহুল্য ও নানারূপ প্রমোদ ব্যবস্থা লোকের মনের উপর হইতে জনকত্বের দাবী হ্রাস করে এবং সহরের নূতন সামাজিক গঠন পারিবারিক জীবনের সাম্য নষ্ট করে। যান্ত্রিক উৎপাদনের ফলে জীবনও অনেকটা যন্ত্রের মত হইয়া পড়ে এবং স্বাভাবিক যৌন সম্বন্ধ ও জনকত্বের স্বাভাবিক শক্তি থাকে না। বিখ্যাত জীববৈজ্ঞানিক ল্যান্সলট হগবেন এই বিষয়টির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন "গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে শিশু বাড়িয়া উঠে, প্রাণী ও জীবজগতে প্রায়শই নবজন্ম দেখিতে পাইয়া তাহা স্বভাবের নিয়ম বলিয়া মনে করে, ভাবে যে এইভাবেই নব নব জীবনের সৃষ্টি। কিন্তু সহরে জন্ম ব্যাপারটি যেন আবিষ্কৃত, তাহারই জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা। ধরাবাঁধা জীবনের ক্ষেত্রে তাহা অনধিকার প্রবেশ। যন্ত্র সৃষ্টি করে না, জন্মও দেয় না—তাহাই মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে।"*

সমাজতাত্ত্বিকেরা এখনও অধিকাংশই ম্যালথাসের রূপকের মোহে আচ্ছন্ন এবং বিশ্বাস করেন পুঁজিবাদ অবসান হইলে জনসংখ্যার সমস্যা আপনা হইতেই ঠিক হইবে। কিন্তু অধ্যাপক হগবেন দেখাইয়াছেন

* What is Ahead of us, p. 184

সহরে জন্মের হার যে কম তাহার সহিত পুঁজিবাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতারই তাহা একটি অনিবার্য্য পরিণাম। জীববৈজ্ঞানিকেরা সেই জন্যই 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' আন্দোলন সুরু করিয়াছেন যাহাতে মানুষ লোপ না পায়।

গ্রাম্য-অর্থনীতির সাক্ষ্য

অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিলেও ছোট ছোট স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্য সম্প্রদায় সৃষ্টি অসম্ভব নহে। সম্প্রতি গ্রামীন জীববিদ্যার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে যাহার ফলে সব দেশেই সব রকম কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন সম্ভব, বিদেশের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই। এই নব-বিদ্যার ফলে শুধু প্রত্যেক দেশে নহে, দেশের প্রত্যেক অংশ অর্থ-নীতির দিক হইতে স্বাধীন হইতে পারে। কালি-ফোর্ণিয়ার অধ্যাপক জেরিক আবিষ্কৃত 'নোঙরামিহীন কৃষি' এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায়; যদি ইহা সফল হয় তাহা হইলে আধুনিক গ্রাম্য-অর্থনীতিতে বিপ্লব সৃষ্টি করিবে। অল্প সংখ্যক শ্রমিক ও সামান্য জমিতে খুব বেশী পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা তখন আদৌ অসম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে আরও খবরের জন্য পাঠকদিগকে ডাঃ উইলকক্সের Nations Can Live at Home নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে বলা যাইতেছে।

বিখ্যাত আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক লুই মামফোর্ড Technics and Civilisation এবং The Culture of Cities নামক গ্রন্থ দুইটিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে জনবহুল ফ্যাক্টরী-আকীর্ণ সহর

প্রাচীন ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। তাঁহার মতে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মনোরম ছোট ছোট সহরে ছোট ছোট কারখানা বসাইয়া দেশের সর্ব্বত্র তাহা ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে—"এই সব কারখানা কুশলী, স্বাস্থ্যকর এবং সমাজ ও শিল্পের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর হইবে।" কয়েক দশক পূর্ব্বে ক্রোপট্কিন The Conquest of Bread এবং Fields, Factories and Workshops নামক গ্রন্থ দুইটিতে এই সত্যই প্রচার করিতে চাহিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক শান্তি

জীববিদ্যা ও সমাজনীতির দিক ছাড়াও আন্তর্জাতিক শান্তির কথা চিন্তা করিলে কেন্দ্রবিচ্যুত সমবায়ী শিল্পসঙ্ঘের কথা স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সর্ব্বপ্রকার শিল্পব্যবস্থা বিদেশী বাজার অধিকার করিবার প্রতিযোগিতায় নামিতে বাধ্য এবং তাহার ফলে ধ্বংস ও হত্যার লীলা সহ যুদ্ধ বাধিবেই। বর্ত্তমান ও গত যুদ্ধের প্রধান কারণ হইতেছে মুনাফার লোভ। বড় বড় কারখানা গড়িলেই এই লোভ দেখা দিবে। সম্মিলিত জাতিদের মধ্যে এখনই যুদ্ধোত্তর বাজার সম্বন্ধে ঘোর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি হাউস অব কমন্সে উপনিবেশের বাজার সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহা হইতেই সকলের চোখ খুলিয়া যাওয়া উচিত। এইজন্যই গান্ধীজি এখানকার বিদেশের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিরোধী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গান্ধীজি আন্তর্জাতিক ব্যবসার বিরোধী নহেন যদি সে

ব্যবসাতে প্রত্যেক দেশের প্রকৃত প্রয়োজন মিটে ও পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক সাম্রাজ্য বিরোধের দিনে তাহা অসম্ভব। সেইজন্যই তিনি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি শান্তি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উপরে স্থাপন করিতে চান। দেশের কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিদেশী বাজার লাভ করিবার কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার নাই। "তোমরা কি বোঝ না যে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার হইলে আর একটি শোষণ করিবার মত পৃথিবী আবিষ্কার করিতে নাদির শাহের মত লোকের প্রয়োজন হইবে? আমাদের বৃটেন, জাপান, আমেরিকা, রুশ ও ইটালীর নৌ ও সেনাবাহিনীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে?" এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাবিলেই আমার মাথা ঘুরিয়া উঠে।"* জাতীয় পরিকল্পনা সমিতিও এই প্রসঙ্গে বলিয়াছে, "জাতির প্রয়োজন মিটানোই তাহার উদ্দেশ্য, এই কাজ করিতে গিয়া অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য-বাদের ভীড়ে প্রবেশ করা নহে।" চীন শিল্প সমবায়ের সুবিধা বর্ণনা করিতে গিয়া নীম ওয়েলস বলিয়াছেন "চীনদেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত না হওয়াই কাম্য, জাপান চীন জয় করুক ইহাও কাম্য নহে। আভ্যন্তরিক শিল্প যদি গণতান্ত্রিক সমবায়ে সংঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে এই দুইটি সম্ভাবনাই কমিবে। এইরূপ স্বাস্থ্যকর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প বিদেশে প্রতিযোগিতার জন্য অগ্রসর হইবে না অথচ দেশের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সমান সমান ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপযোগী বাজার সৃষ্টি করিবে।"

* Harijan 29-8-1936.

অন্যান্য সাক্ষ্য

কুটীর শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সাম্যবাদ গান্ধীজির পাগলামি নহে; বিভিন্ন দিক হইতে দেখিলে ইহা বৈজ্ঞানিক ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা সম্প্রতি পাশ্চাত্য চিন্তা-নায়কদের প্রশংসাও সমর্থন লাভ করিয়াছে। বৃটিশ সোস্থাল সিকিউরিটি প্ল্যানের প্রণেতা স্যার উইলিয়ম বিভারিজ ভারতে অনুরূপ একটি ব্যবস্থা প্রচলন সম্পর্কে বলিয়াছেন, "ভারতের শিল্প হয়ত সম্প্রসারিত হইবে, কিন্তু সম্প্রসারণ কালে ইহা লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাহা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া থাকে, আমাদের দেশ ও আমেরিকার মত মারাত্মক ঘিঞ্জি সহর সৃষ্টি না করে।"

একজন ফরাসী অর্থনীতিবিদ হায়াসাঁথ ড্যুবরয়েল দেখায়াইছেন যে "প্রকাণ্ড শিল্পও এমন ভাবে সংগঠিত হইতে পারে যে উহার অংশগুলি স্বাধীন থাকিবে।" এইসব অংশ যে শিল্পটির কর্ম্মকুশলতা কিছু মাত্রও হ্রাস করিবে না তাহার কারণ তিনি দেখাইয়াছেন। ইয়োরোপের বিখ্যাত চিন্তানায়ক কাউন্ট কুডেনফ-কালেজি তাঁহার Totalitarian State Against Man নামক গ্রন্থে কৃষি সমবায়ের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন একমাত্র ইহাই রণক্লান্ত পৃথিবীর সকল কষ্ট দূর করিতে পারে। একটি অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য হইবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন সত্ত্বাগুলির সমবায় সূত্রে সংগঠন করা। অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও সঙ্ঘবাদ দুইই ইহাতে বর্জ্জনীয়। ইহার আদর্শ দেখিতে

পাওয়া যাইবে কৃষি সমবায়ে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সকল সুবিধা পারস্পরিক সাহায্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সহিত যুক্ত।

আমাদের দেশে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় গ্রাম্য সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন "ভারতবর্ষের পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য জাতীয় উদগ্রতা অথবা স্বেচ্ছাচার নহে, যাহা ফ্যাসিষ্ট দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক দেশগুলির মত সামান্য কয়েকজন পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে পরিচালন ক্ষমতা দিয়া অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ইহার উদ্দেশ্য নহে, অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার মত জড়বাদী সংস্কৃতিও নহে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পিছনে যে উদ্দেশ্য তাহার একদিকে গ্রামের কৃষিপ্রধান সভ্যতার আর্থিক ভিত্তি প্রসারিত করিয়া জাতীয় প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জ্জন করা, অপরদিকে অতি প্রাচীন নৈতিক ও সামাজিক গুণগুলি পরিবর্ত্তিত পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা।"*

জাতীয় অর্থনীতিতে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বম্বে পরিকল্পনার প্রণেতারাও অস্বীকার করেন নাই। "শিল্প গড়িয়া তুলিবার সময় আমাদের কুটীর-শিল্পগুলি যাহাতে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় তাহা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকিবে। ইহার ফলে লোককে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার সুবিধা ত হইবেই উপরন্তু পরিকল্পনার প্রথম দিকে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তাও ইহাতে কমিবে।"

কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই উক্তি সত্ত্বেও কুটীর-শিল্পকে বম্বে পরিকল্পনার প্রণেতারা কি দৃষ্টিতে দেখেন তাহা পরিষ্কার নহে। তাঁহারা কি শুধুই ঐসব শিল্পকে পরিকল্পনার প্রথম দিকে বাড়িবার

* Economic Problems of Modern India

সুযোগ দিবেন অথবা তাঁহারা মনে করেন যে কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য বিধান করিতে অবশ্য-করণীয়? পরিবর্ত্তনের সময়ে বিদেশী পুঁজির চাহিদা কমাইবার জন্যই যদি কুটীর-শিল্প গড়িয়া তোলা হয় যাহাতে ভবিষ্যতে বড় বড় কারখানা সৃষ্টি হইলেই এইগুলি লোপ করা যাইবে, তাহা হইলে বলিব বম্বে পরিকল্পনার প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

চীন দেশের কথা

যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত চীনে কুটীর-শিল্প খুব সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে। নীম ওয়েলস China Builds for Democracy নামক গ্রন্থে চীনের শিল্প সমবায়ের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। ১৯৩৮ সালের মধ্যে চীনের শতকরা আশীভাগ শিল্প জাপান ধ্বংশ করিয়া দিয়াছে। তাহার ফলে শত শত শ্রমিক গৃহহারা, তাহাদের কাজ নাই। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট সময় কয়েকজন চীনা যুবক রেউই এলির নেতৃত্বে চীনের গ্রামাঞ্চলে শিল্প সমবায় গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা করে। এই সমবায় শিল্প এখন চীনের গৌরব ও সম্পদ। বিদেশী আক্রমণের সম্মুখে এই প্রতিষ্ঠান শুধু যে অপরাজেয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা নহে, যে সময়ে দেশের সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক সম্পাদ বোমায় বিচূর্ণ তখন দেশের লোকের অবশ্য-প্রয়োজনীয় পণ্য জোগান দিয়া জাতীয় জীবনীশক্তি রক্ষা করিয়াছে। চীন দেশে স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ হাজার হাজার সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব সমিতি ছোট ছোট যন্ত্রের সাহায্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনের সব কিছু উৎপন্ন করিতেছে যথা: খাদ্য,

কাপড়, কাগজ, সাবান, তেল, কাঁচের বাসন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধ, লোহার জিনিষপত্র এবং যন্ত্রাদি, চামড়ার জিনিষ, হাসপাতালের সরঞ্জাম ও আসবাব পত্র। এই সমবায় সমিতিগুলি নার্সারী, দিন ও রাত্রির স্কুল, হাসপাতাল ও প্রমোদভবন পরিচালনা করিতেছে। ১৯৪০ সালে এই সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ১৫০০; ১৯৪২এ ৬০০০ এবং ১৯৪৩-এ সংখ্যা ১০,০০০ হাজারের উপরে ওঠে। এই সমিতিগুলির মাসিক উৎপাদন হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা হয় যে মোট যে টাকা ইহাতে খাটিতেছে মাসিক উৎপন্নের মূল্য তাহার দ্বিগুণ। যুদ্ধের জন্যই হয়ত এই মূল্য পাওয়া সম্ভব, তথাপি ব্যাপারটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। এই শিল্প সমবায়—ইনডাসকো—যুদ্ধের সময় চীনের বিশেষ সহায়, যুদ্ধোত্তর শিল্প পুনর্গঠনের সময় খুব কাজে আসিবে। নীম ওয়েল্‌স লিখিয়াছেন যে, 'চীনের অভিজ্ঞ লোকের সুচিন্তিত মত ইহাই যে সমবায় প্রতিষ্ঠানই চীনের শিল্প প্রসারে বর্ত্তমানে এবং যুদ্ধের পরেও সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব উপায়। কয়েকজন বৃটিশ ও আমেরিকার পর্য্যবেক্ষক এই মত সমর্থন করেন।' "আমাদের যুগের যুদ্ধ ও সামাজিক বিপত্তির মধ্যেই চীনের অভ্যন্তরে যে প্রগতিশীল আন্দোলন চলিতেছে তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। যুদ্ধের মধ্যেই যে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শিল্প গঠনের চেষ্টা চলিতেছে তাহাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনকামী চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহী বহু পর্য্যবেক্ষকের তাহা কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছে। Asia and the Americas পত্রিকার যে সংখ্যায় চীনের এই "গেরিলা শিল্প" সম্বন্ধে এডগার স্নো এই মত প্রকাশ করিয়াছেন:
"যুদ্ধের শেষদিকে ইহা শুধু যে জয়লাভ করিতে সহায়তা করিবে তাহা

নহে, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে চীনের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার যে আশা প্রতিষ্ঠাতারা পোষণ করেন সুযোগ পাইলে তাহাও সফল হইবে।"

চীনের 'ইনডাসকো' আন্দোলনের মূল্য ভারতবর্ষেও যথেষ্ট। নীম ওয়েলসের পুস্তকের ভূমিকায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, "চীনের মত ভারতবর্ষেরও বিপুল জনবল, বেকার সমস্যা ও আংশিক কাজে নিযুক্ত লোকের সমস্যা রহিয়াছে। ইয়োরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে যে ভাবে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া লাভ নাই। যে পরিকল্পনার ফলে আমাদের জনশক্তি অপব্যয়িত হইবে, অথবা লোককে কর্ম্মহীন করিবে তাহা অত্যন্ত খারাপ। মানবিকতার কথা বাদ দিলেও, নিছক অর্থনৈতিক দিক হইতে দেখিলে অধিক সংখ্যায় লোক নিয়োগ করিয়া জটিল যন্ত্র কম ব্যবহার করা লাভজনক। অধিকাংশ লোককে বেকার রাখা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে অল্প আয়ে কাজে নিয়োগ করা ভাল। ইহাও সম্ভব যে বহু সংখ্যক কুটীরজাত পণ্যের পরিমাণ ফ্যাক্টরী হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইবে।"

জাপানের কথা

ইহা সকলেরই জানা আছে যে জাপান গৃহজাত ছোট ছোট শিল্পের দেশ। গুয়েনথার স্টাইন Made in Japan নামক পুস্তকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিতরূপ হিসাব দিয়াছেন :—

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান	—	শতকরা	১০
ছোট "	—	"	২৯
মাঝারি "	—	"	৩৫
বড় "	—	"	২৬

এই সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু ব্যবহারের জিনিস উৎপন্ন করে না। যন্ত্রাদিও তৈয়ারী করে। বলা হইয়াছে যে জাপানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির শতকরা ৩৪ ভাগ মাত্র বড় কারখানায় তৈয়ারী হয়। অধ্যাপক অ্যালেন Japanese Industry: Its recent Development and Present Condition গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, "আমরা বলিতে পারি যে জাপানের শিল্প যে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত তাহা জাপানের দুর্ব্বলতা সূচিত করে না, দেশের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া শিল্পব্যবস্থা যথোপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই ইহাতে বুঝিতে হইবে। সে দেশে মূলধন দুষ্প্রাপ্য কিন্তু শ্রমিক যথেষ্ট এবং সস্তা।"

ভারতেরও সেই অবস্থা। কিন্তু জাপানের এই ছোট শিল্পায়তনগুলি সমবায় ব্যবস্থাদ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ নহে, কয়েকজন বড় শিল্পপতিই তাহার মালিক। ইহা আদৌ কাম্য নহে, কারণ কুটীর-শিল্পের শ্রমিকেরা নিজেদের মালিক না হইয়া পুঁজিবাদী খর্পরে শোষিত হইতেছে।

অন্যান্য দেশের কথা

'উৎপন্নকারী মালিকের সমবায়', যাহার প্রচলিত নাম 'Incops,' সোভিয়েট রাশিয়ায় বিশেষ কর্ম্মকুশলতা অর্জ্জন করিয়াছে। সিডনী ও বিয়াত্রিচ ওয়েব Soviet Communism: A

New Civilization গ্রন্থে দেখাইয়াছেন সোভিয়েট সরকারের সহায়তায় ১৯১৯ হইতে বিশেষ করিয়া ১৯৩২ সালের পরে কেমন করিয়া এই সমবায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। "এই ব্যবস্থায় সভ্যেরা মাহিনা লয় না, কোন রকম কাজের চুক্তিতে আবদ্ধ নহে। তাহারা ব্যক্তিগত অথবা যৌথভাবে নিজেদের শ্রমে উৎপন্ন ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিক।" ১৯৩২ সালের প্রারম্ভে এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ সমবায়ের সংখ্যা ছিল ২০,০০০; তাহাদের কারখানা ছিল ৩০,০০০ এবং মোট সভ্যসংখ্যা ২,৩৫০,০০০। তখনকার জনসংখ্যায় প্রায় ৭০।৮০ লক্ষ লোকের ইহা প্রতিনিধি। এই প্রতিষ্ঠান গুলির উৎপন্নের পরিমাণ সাড়ে চারশত কোটি রুবল।

এমন কি ইংলণ্ডেও স্বায়ত্বশাসন সম্পন্ন সমবায় সম্বন্ধে নূতন করিয়া কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে, কারণ যুদ্ধের ফলে কেন্দ্রবিচ্যুত শিল্প গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন গুলি ছোট শিল্প সংগঠিত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে এবং তাহা জার্ম্মানীর ব্লিৎসক্রিগ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এখন ৪৪টি সমবায় ফ্যাক্টরি আছে। নীম ওয়েলস দেখাইয়াছেন যে আমেরিকায় উৎপাদক সমবায় প্রতিষ্ঠানদ্বারা সমবায়-প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে দেশ এখন আর শুধু গ্রাহক, বিক্রয় ও ঋণ সমবায়ে সন্তুষ্ট নহে। সমবায় কৃষি, স্বাস্থ্য ও বীমা সে দেশে গঠিত হইয়াছে। শ্রম বিভাগের হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৬ সালে ৪১০০টি বিভিন্ন প্রকারের সমিতি ও তাহার ৮,৩০,০০০ সভ্য ছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য সমবায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এমন কি জার্ম্মানীতেও হিটলার পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা করিতে কিছু কিছু কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

উপসংহার

কাজেই দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক গতি হইতেছে কেন্দ্র-বিচ্যুতি ও কুটীর-শিল্পগত সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে। এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে বহু অতীতকাল হইতে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, অবশ্য আধুনিককালের উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশ এখন 'দানবের দাঁত' বপন করিয়া তাহার ফসল কুড়াইতেছে, আমাদের তাহা অনুকরণ করিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন একটি পরিকল্পনা ভারতবর্ষে করিতে হইবে যাহা দেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবে। এই দেশজ ব্যবস্থার প্রথম পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ডাঃ অ্যানি বেসান্ত তাঁহার কমনওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া বিলে। গান্ধীজিও গ্রাম্য সম্প্রদায় ও কুটীর-শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন।

এ পুস্তিকার এতগুলি পৃষ্ঠা গান্ধীজির অর্থনৈতিক মতের মূল তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করিবার জন্য ব্যয় করাতে আমার কোনও কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নাই। গান্ধীজির পরিকল্পনায় জীবনের মূল্য-মান নূতন ভাবে বিবেচিত হইয়াছে কাজেই ঐগুলি পরিষ্কার করিয়া বলা হিসাব দাখিল করিবার চাইতে অধিক প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ; এদেশের শতকরা ৯০ জন লোক কৃষি অথবা কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। গ্রামে যত লোক বাস করে তাহারা শুধু গরীব নহে, ঘোর অজ্ঞানতার অন্ধকারেও আচ্ছন্ন। কাজেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের জনগণের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করা। এই উন্নতির একটি সর্ব্বনিম্ন মান পূর্ব্ব হইতে অবশ্য স্থির করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা গ্রামের উন্নতির কথাই চিন্তা করে বলিয়া কৃষির উন্নতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট কুটীর-শিল্প বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে চায়। কিন্তু যেহেতু পরিকল্পনাতে জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিক বাদ দেওয়া চলে না সেইজন্য মৌলিক শিল্প গড়িয়া তুলিবার কথাও বিবেচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে যাহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে, জীবনের সমস্ত দিকের উন্নতির যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে বস্তুগত, নীতিগত ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার কথা সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করা হইয়াছে।

নিম্নতম মান

বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বলিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার মত সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মিটাইয়া নিম্নতম স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিবার কথা বুঝায়। এইগুলি হইতেছে :

(১) প্রোটিন, শর্করা, স্নেহ, খনিজ ও ভিটামিনযুক্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য।

(২) শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার মত যথেষ্ট বস্ত্র ও পোষাক।

(৩) প্রত্যেকের জন্য ১০০ বর্গফুট পরিমাণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

(৪) স্কুলে যাইতে পারে এমন বয়সের প্রত্যেক শিশুর বিনা ব্যয়ে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা, এবং প্রত্যেক বয়স্ক লোককে মোটামুটি লিখিতে পড়িতে শিখানো।

(৫) চিকিৎসার সুবিধা—প্রত্যেকে অনায়াসে ভাল হাসপাতালে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পাইবে। মেয়েদের জন্য ভাল প্রসূতি আগার থাকিবে।

(৬) পোষ্টাফিস, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওর প্রভৃতির ন্যায় সকলের জন্য ইউটিলিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা করা।

(৭) আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা—বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে। খেলার মাঠ, রঙ্গমঞ্চ, ভজনমণ্ডল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে।

খাদ্য

খাদ্য ও বস্ত্র সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা লাভজনক।

সকলেরই জানা আছে ভারতের জনসাধারণের খাদ্য সামগ্রী সমস্যার

অভাব এবং তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায় না। ডাঃ এ্যাক্রয়েডের হিসাব মত সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ ঃ

		সামঞ্জস্যপূর্ণ		সামঞ্জস্যহীন
শস্য (চাউল, আটা প্রভৃতি)		১৫ আউন্স		২০ আউন্স
ডাল	...	৩ ,,	...	১ ,,
তরকারী	...	৬ ,,	...	২ ,,
শাকসব্জী	...	৪ ,,	...	২ ,,
তেল-ঘি	...	২ ,,	...	২ ,,
ফল	...	২ ,,	...	— ,,
দুধ	...	৮ ,,	...	২ ,,

মোটামুটি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে ২,৬০০ ক্যালরি উত্তাপ উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন তাহা সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য হইতে পাওয়া যায়। ডাঃ এ্যাকরয়েডের হিসাব মত সাধারণ সামঞ্জস্যহীন খাদ্য হইতে উৎপন্ন ক্যালরির পরিমাণ ১৮০০ ক্যালরির বেশী নহে এই হিসাবও একটু বেশীর দিকেই ধরা হইয়াছে। মাথা পিছু আয় এত কম যে লোকে পুষ্টিকর সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য কিছুতেই খাইতে পায় না। উপরন্তু আমাদের দেশে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেইজন্যেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির উন্নতি বিধান করা প্রয়োজনীয়। খাদ্য দ্রব্য উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ানোই যথেষ্ট নহে, উৎপন্নের পুষ্টিগুণ বিবেচনা করিতে হইবে। যে শস্য হইতে টাকা আয় হয় অথবা ব্যবসাতে যাহা লাভজনক বর্ত্তমানে যে তাহারই চাষের ব্যবস্থা আছে তাহা দূর

করিতে হইবে। পরিবর্তে প্রাদেশিক প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া খাদ্য শস্যের চাষ বাড়াইতে হইবে।

বস্ত্র

জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের স্থান। আবহাওয়া অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে বস্ত্রের চাহিদা নির্ণিত হইবে। ১৯৩৬-৩৭ সালে মাথাপিছু বস্ত্র লাগিত ১৫.৫ গজ। অন্যান্য দেশের ১৯২৯ সালের কাপড়ের হিসাব নিম্নরূপ ঃ

আমেরিকা—	...	৬৪ গজ
জার্ম্মাণী—	...	৩৪ ,,
জাপান—	...	২১.৪ ,,
মিশর—	...	১৯.১ ,,

কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি এবং বম্বে পরিকল্পনার মতে মাথাপিছু ৩০ গজ কাপড়ের বরাদ্দ ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট। ভারতের মত গরীব দেশে যেখানে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে সঙ্গতির বিপুল পার্থক্য, সেখানে এই রকম গড়পড়তা হিসাব ভুল ধারণা সৃষ্টি করিতে পারে, সেই জন্যই বিশেষ করিয়া বলা দরকার গ্রামের লোকের শতকরা নব্বুই জন লোকের জন্য মাথা পিছু ২০ গজ কাপড়ের বরাদ্দ করা হইবে। আরও বলা উচিত যে এই কুড়ি গজ এক বছর চলিবে। একখানা কাপড় যদি ছয়মাস টেঁকে তাহা হইলে গ্রামের লোকের গড় চাহিদা দ্বিগুণ করিয়া দিতে হইবে।

মাথা পিছু আয়

ভারতবর্ষের মাথা পিছু আয়ের হিসাব মাঝেমাঝে করা হইয়াছে। দাদাভাই নৌরজীও প্রথমে এই চেষ্টা করেন এবং তাঁহার মতে মাথা পিছু বার্ষিক আয় ২০৲ টাকা মাত্র। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক হিসাব দিয়াছেন ডাঃ ডি. কে. আর. ভি রাও; তিনি ১৯৩১-৩২ সালের মাথা পিছু আয় স্থির করিয়াছেন ৬৫৲ টাকা।

এইসব হিসাব হইতে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার বাস্তব রূপটি বোঝা যায় না। এই হিসাবের মধ্যে লাখপতি ক্রোড়পতিদের আয় রহিয়াছে আবার অগণিত জনগণের সামান্য আয়ও ধরা হইয়াছে। একজন লোক নদীর গভীরতা আন্দাজ করিতে পাড়ের কাছে ও মাঝখানের গভীরতা হইতে একটা গড় স্থির করিয়াছিল। এই হিসাব অনুযায়ী নদী পার হইতে গিয়া সে ডুবিয়া যায়। আমাদের আয়ের হিসাবও এই নির্ব্বোধের নদীর গভীরতা মাপিবার মত। ধনী ও নির্ধনের আয়ের তারতম্য অত্যন্ত অধিক। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ জনসংখ্যার একভাগ পাইয়া থাকে, ৩৩ ভাগ পায় বত্রিশ জন লোকে এবং অবশিষ্ট ৩২ ভাগ পায় বাকি শতকরা সাতষট্টি জন লোক। মাথা পিছু আয়বৃদ্ধির হিসাব যদি এইভাবে করা হয়, ধনীর আয়বৃদ্ধি হইয়া যদি গরীবদের উল্লেখযোগ্য কিছুই আয় না বাড়ে তাহা হইলেও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি দেখানো সম্ভব। ইহা হিসাবের কুহক, বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ইহার নাই।

Report of the Industrial Survey Committee of the Central Provinces and Berar (1942) এ অধ্যাপক জে. সি. কুমারাপ্পা মন্তব্য করিয়াছেন :

"আমাদের হিসাব ৬০৬টি গ্রাম ঘুরিয়া তৈয়ারী বলিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সাধারণ লোকের সর্ব্বত্রই কত কম আয়। বস্ত্রবয়নের মত কুশলী শিল্পেও প্রতি পরিবারে বৎসরে ৫০৲ হইতে ৭০৲ টাকার বেশী আয় করিতে পারে না। এই হিসাবে মাথা পিছু আয় বৎসরে ১২৲ টাকা। গ্রামের লোকে যদি বৎসরের প্রতিদিন এক আনা করিয়া আয় করিতে পারে তাহা হইলেই নিজের অবস্থা স্বচ্ছল বলিয়া মনে করে। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এই প্রদেশেই মাথা-পিছু বাৎসরিক আয় ১২৲ টাকার কাছাকাছি। আমরা প্রত্যেক জেলা হইতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ধরিয়া এই হিসাব সংগ্রহ করিয়াছি। কাহারও এই হিসাব অবিশ্বাস হইলে গ্রামে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পারেন।" (Part I, Volume I, p. 6)

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীব দেশ। কাজেই এই হিসাবের ভিত্তিতে ভারতের শতকরা ৯০ জন লোকের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ১৮৲ বলিয়া ধরিতে পারি। এই আয় নিতান্তই কম এবং ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত হীন এবং গ্রামবাসীরা আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত। প্রসঙ্গত অন্যান্য দেশের মাথাপিছু আয়ের হিসাব এইখানে দেওয়া যাইতে পারে।

	সাল	আয়
গ্রেটবৃটেন	১৯৩১	১,০১৩ টাকা
আমেরিকা	১৯৩২	১,১৮৬ ,,

জার্ম্মাণী	১৯২৫	৫২০ ,,
জাপান	১৯২৫	১৭৬ ,,
সোভিয়েট রাশিয়া	১৯২৫	১৩৩ ,,

নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়

ডাঃ এ্যাকরয়েডের হিসাব মত সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বেকার হিসাবে মাসে মাথাপিছু ৬৲ টাকা।

গ্রামে এই খরচ মাথাপিছু মাসে ৫৲ টাকা অথবা বৎসরে ৬০৲ টাকা হইতে পারে। মাথাপিছু ২০ গজ কাপড় লাগিবে ধরিয়া লইলে, গজ প্রতি তিন আনা হিসাবে মাথাপিছু বাৎসরিক কাপড় বাবদ ব্যয় হইবে ৩৷৵০, ধরা যাউক ৪৲ টাকা। বাড়ি মেরামত, ঔষধপত্র ও অন্যান্য ব্যয় বাৎসরিক ৮৲ টাকা ধরা যাইতে পারে। কাজেই প্রত্যেকের অন্তত বৎসরে ৭২৲ টাকা খরচ লাগে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গ্রামাঞ্চলে বাৎসরিক মাথাপিছু আয় ১৮৲ টাকা। কাজেই মোট জনসংখ্যার শতকরা নব্বুই ভাগের আয় চার গুণ বাড়াইতে হইবে। গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমবায় প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গঠিত করিয়া কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উন্নতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করিতে পারিলেই ইহা সম্ভব হইবে।

গ্রাম্য সম্প্রদায়

ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে হইলে গ্রাম্য সম্প্রদায় অথবা অতীতের গ্রাম পঞ্চায়েৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে,

অবশ্য আধুনিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। এই পঞ্চায়েৎগুলি জেলা ও লোকালবোর্ড হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হইবে, এই বোর্ডগুলির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পঞ্চায়েৎগুলি আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে স্বাধীন থাকিবে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপাদান প্রভৃতি জীবনের মূল প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান দেওয়া সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। এই পঞ্চায়েৎগুলি তালুক, জেলা, প্রদেশ ও দেশের সহিত সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে সংযুক্ত থাকিবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলিতে পূর্ণবয়স্কদের ভোটদ্বারা সোজাসুজি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে। তালুক, জেলা, প্রভৃতি উচ্চতর পরিষদে সাধারণত পরোক্ষ নির্ব্বাচন হইবে। এই কেন্দ্র-বিচ্যুত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক গঠনের সুবিধা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব পরিকল্পনার ভিত্তি হইবে গ্রাম; অর্থনৈতিক পুনর্গঠন নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, উপর হইতে নীচের দিকে গেলে চলিবে না।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কাজ

গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির প্রধান কাজ হইবে:

(ক) ভূমি কর নির্দ্ধারণ ও গ্রামের পক্ষ হইতে তাহা আদায় করা। প্রজাস্বত্ব আলোচনা করিবার সময় বিষয়টি বিশদ ভাবে বিবৃত করা হইবে।

(খ) স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

(গ) সালিশী মীমাংসা ছাড়াও স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করা।

আধুনিক বিচার ব্যবস্থা যে অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়সঙ্কুল, শুধু তাহাই নহে, গ্রামের সাধুতা ও যৌথ বুদ্ধির মূলে ইহা আঘাত করিয়াছে।

(ঘ) শিক্ষার ব্যবস্থা করা। স্কুলগুলি পঞ্চায়েতের পরিচালনাধীন থাকিবে।

(ঙ) ডিস্পেন্সারি, গ্রাম্য হাসপাতাল, ও প্রসূতি আগার প্রভৃতির ব্যবস্থা।

(চ) স্বাস্থ্যরক্ষা, সরকারী ঘরবাড়ী, রাস্তা, পুকুর, কূপ, প্রভৃতি রক্ষা করা।

(ছ) সমবায় ব্যবস্থায় গ্রামের কৃষির উন্নতি বিধান।

(জ) পঞ্চায়েতের পরিচালনাধীনে গ্রামে ঋণ ও অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া গ্রামের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা।

(ঝ) সমবায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে কাঁচা ও তৈরী মাল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।

ভারতের সমবায় আন্দোলনে ইপ্সিত ফল লাভ হয় নাই। তাহার কারণ, এই ব্যবস্থা উপর হইতে গ্রামবাসীদের উপরে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে পঞ্চায়েৎ আইনেও সুফল পাওয়া যায় নাই, কারণ এই সব পঞ্চায়েতের ক্ষমতা অত্যন্ত অল্প। ইহা সত্য যে পুরাতন গ্রাম্য সমাজ অত্যন্ত ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের বহু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্ত্তমান বর্ণবিভাগ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য পঞ্চায়েতের কার্য্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এই পঞ্চায়েৎগুলির পুনরুজ্জীবনেই ভারতের আশা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে।

কৃষি

কৃষিই ভারতের প্রধান উপজীবিকা। যে কোনও পরিকল্পনায় কৃষি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। উপরন্তু কৃষি ও শিল্প পরস্পর-বিরোধী নহে বরং প্রতিপূরক। শিল্প ও কৃষি পৃথক বিষয় মনে করিয়া পরস্পরের শতকরা হার নির্ণয় করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নহে। বড় বড় মৌলিক শিল্প ব্যতীত কৃষি ও শিল্প একত্র সমন্বয় করাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই সমন্বয়ের কাজ এমন ভাবে হইবে যে চাষের জমির পাশেই থাকিবে ফ্যাক্টরী ও ছোট ছোট কারখানা। শ্রমিকের জন্য এই ব্যবস্থায় যে দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে তাহা নহে, ইহাই একমাত্র ব্যবস্থা যাহার ফলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও হিতকর জাতীয় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের কৃষি উন্নত করিবার সময় নীচের বিষয় কয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে :

(ক) প্রধান উদ্দেশ্য হইবে দেশের সকল লোকের যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা।

(খ) বিভিন্ন প্রদেশের আবহাওয়া অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের শস্য চাষ করিতে হইবে।

(গ) যতদূর সম্ভব দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য ও শিল্পের জন্য কাঁচা মাল দেশেই উৎপন্ন করিতে হইবে। অতিরিক্ত যদি কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে তবেই তাহা রপ্তানি করা যাইতে পারে।

(ঘ) যান বাহনের উপর যাহাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে তাহার জন্য

প্রত্যেক প্রদেশে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য ও কাঁচা মাল উৎপন্ন করিতে পারে।

(ঙ) টাকার জন্য আন্দোল যে চাষ করা হয়, যাহার উদ্দেশ্য স্থানীয় চাহিদা মিটানো নহে, দূরের বাজারে উৎপন্ন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করা—তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(চ) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গবেষণা করিবার জন্য কৃষি-আগার স্থাপন করিতে হইবে ; এইগুলি আদর্শ কৃষি-আগার হিসাবে থাকিবে।

খাদ্যের ঘাটতি

ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জীর হিসাব মত ভারতবর্ষ খাদ্য শস্য উৎপাদন ব্যাপারে ঘাটতি দেশ। হিসাবটি এইরূপ :*

ভারতের ১৯৩৫ সালে জনসংখ্যা—	৩২ কোটি ৯০ লক্ষ
ভারতের খাদ্য ঘাটতি—	৫১১০ কোটি ক্যালরি
কত লোক না খাইয়া থাকে—	৪ কোটি ৮০ লক্ষ

বাংলা দেশের সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ যদিও মানুষের সৃষ্টি তথাপি তাহা হইতে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারা গিয়াছে। অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে শস্য উৎপন্নের পরিমাণ নিতান্ত কম :†$

*Food Planning for 400 Millions p.26 †Statistical Year Book of the League of Nations, 1933-34 $এই হিসাবও সম্ভবতঃ সঠিক হিসাব অপেক্ষা কম।

(একর প্রতি পাউণ্ডে হিসাব)

দেশ	গম	চাউল	আখ	তুলা
মিশর	১,৯১৮	২,৯৯৮	৭০,৩০২	৫৩৫
জাপান	১,৭১৩	৩,৪৪৪	৪৭,৫৩৪	১৯৬
আমেরিকা	৮১২	২,১৮৫	৪৩,২৭০	২৬৮
চীন	৯৮৯	২,৪৩৩	—	২০৪
ভারতবর্ষ	৬৬০	১,২৪০	৩৪,৯৪৪	৮৯

প্রজাস্বত্ব ও ভূমির কর

ভারতবর্ষে শস্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে কয়েকটি আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কারের প্রথম হইতেছে জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা ও মৌজাওয়ারি স্বত্বের প্রবর্ত্তন করা। জমিদারী সামন্তপ্রথার ভগ্নাবশেষ এবং সেই কারণে তাহা এখন অচল। প্রত্যেক চাষীর সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সর্ব্বাধিক রাজস্ব আদায় করিবার জন্যই রায়তিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। এই জন্যই মৌজাওয়ারি ভূমিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা দরকার; এই ব্যবস্থায় গ্রামের সকলেই যৌথ-ভাবে সমগ্র রাজস্বের জন্য রাষ্ট্রের নিকট দায়ী থাকিবে। প্রত্যেক কৃষকের দেয় করের পরিমাণ গ্রামের লোকেরাই স্থির করিবে, এখানকার মত পাটোয়ারি দ্বারা তাহা স্থির করা হইবে না। রায়তি প্রথাই গ্রাম্য সমাজ উৎখাতের প্রত্যক্ষ কারণ। মৌজাওয়ারি প্রথার প্রবর্ত্তনে আবার ভারতবর্ষে প্রাচীন গ্রাম্য যৌথ-জীবন ফিরিয়া আসিবে।

গ্রামের পঞ্চায়েৎ দীর্ঘদিনের জন্য কৃষককে জমি ইজারা দিবে; যতদিন পর্য্যন্ত সে কর দিবে ততদিন ইজারা বলবৎ থাকিবে। বর্ত্তমান কর ও রাজস্বের পরিমাণ অনেক কমাইতে হইবে। কর বাকি পড়িলে অন্যান্য ঋণ যে ভাবে আদায় করা হয় সে পন্থায় আদায় করা হইবে, জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইবে না প্রাচীন ভারতের মত কর, অন্ততপক্ষে ফসলের ⅙ অথবা ⅛ অংশ আদায় করা হইবে। শস্য দ্বারা কর দিতে দেওয়া হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা অসুবিধাজনক নিশ্চয়ই। কিন্তু রায়তের দিক হইতে দেখিলে এই ব্যবস্থা ন্যায্য এবং সুবিধাজনক কারণ এই কর ফসলের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। উপরন্তু প্রায় দেখা যায় যে কৃষকেরা কর দিবার জন্যই বাধ্য হইয়া ফসল বিক্রয় করে। এই ভাবে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করার জন্য ফসলের দাম কমিয়া যায়। কিছুদিন পরে আবার এই কৃষকদেরই উচ্চমূল্যে এই ফসল কিনিতে হয়। ফসল দিয়া কর দেওয়া সম্ভব হইলে তাহারা মহাজনের কবল হইতেও রেহাই পাইবে।

ভূমি জাতীয়সম্পত্তিতে পরিণত করা

মৌজাওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে জমিদার, তালুকদার, মালগুজার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ভূমি জাতীয়সম্পত্তিতে পরিণত হইবে, কৃষক ও রাষ্ট্রের মাঝখানে অপর কোন স্বত্ব থাকিবে না। যাহারা সত্যই জমি চাষ করে তাহাদিগকে দীর্ঘ দিনের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হইবে। এই ইজারা পিতার নিকট হইতে পুত্রে বর্ত্তাইবে। যাহারা জমি চাষ করে তাহাদের কাছে ছাড়া আর কাহারও নিকট

এই জমি হস্তান্তর করা চলিবে না। অনুপস্থিত ভূস্বামী আর থাকিবে না। বর্ত্তমানের যে সকল স্বার্থ জমির সহিত জড়িত তাহা তুলিয়া দিতে কিছুদিন সময় অবশ্যই দিতে হইবে। যাহাদের স্বার্থ আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের কিছু কিছু খেসারত দেওয়া হইবে। অনেক জমি ভূস্বামীরা খাস করিয়া লইয়াছেন তাহার কারণ হইতেছে ভূমি-আইনের ত্রুটি ও কঠোর কুসীদ ব্যবস্থা। এখন যাহারা এই উপায়ে জমির মালিক হইয়াছে তাহাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। বেশী পরিমাণে উত্তরাধিকার কর প্রবর্ত্তন করিয়াও ধীরে ধীরে জমি জাতীয়সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। যে কোনও ভূমিস্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে পাইলে তাহার মূল্যের অন্তত শতকরা ৫০ টাকা কর দিতে হইবে। এই ভাবে দুই যুগের মধ্যেই ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

জমি খণ্ডিতকরণ

জমির উৎপন্ন বাড়াইবার পথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাধা হইতেছে ভারতবর্ষে সম উত্তরাধিকারের যে আইন আছে তাহার ফলে জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে। এইভাবে জমি খণ্ডিত হওয়ার অসুবিধা এত প্রত্যক্ষ যে তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কৃষকের মাথা পিছু জমির পরিমাণ সম্বন্ধে ১৯২১ সালের সেন্সাসে নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে :

বম্বে—	১২.২ একর	বাংলা—	৩.১ একর

পাঞ্জাব—	৯.২ একর	বিহার ও উড়িষ্যা—	৩.১ একর
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৮.৫ ,,	আসাম—	৩.০ ,,
মাদ্রাজ—	৪.৯ ,,	যুক্তপ্রদেশ—	২.৫ ,,

অন্যান্য প্রদেশের গড়পরতায় একদাগের জমির পরিমাণ এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে :*

আমেরিকা—	১৪৫ একর	জার্ম্মাণী—	২১.৫ একর
ডেনমার্ক—	৪০ ,,	ইংলণ্ড—	২০.০ ,,

জমি খণ্ডিত হওয়ায় যে অসুবিধা তাহা প্রতিরোধ করিতে নিম্নপ্রদত্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে :

(ক) পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও বরোদায় সমবায় প্রথায় যে ভাবে জমি একত্রিত করা হইয়াছে তাহা অবলম্বন করা।

(খ) ছোট ছোট জমির সীমানা তুলিয়া দিয়া সংলগ্ন জমিগুলি একত্রে সমবায় প্রথায় চায করিবার ব্যবস্থা করা। সোভিয়েট রাশিয়ায় যে প্রকাণ্ড ফার্ম্ম গঠিত হইয়াছে এই ব্যবস্থাকে তাহার সহিত ভুল করা চলিবে না। সমবায় চাষে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং একত্র চাষের সুবিধা বজায় করা হইবে।

(গ) বর্ত্তমান উত্তরাধিকার আইন সংস্কার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে নিম্নতম আকারের ছোট করিয়া জমি ভাগ করা চলিবে না। যদি জমির নিম্নতম আকার ২০ একর ধরা হয় এবং একজন লোকের ২০ একর জমি থাকে এবং তাহার দুইটি ছেলে যদি ভিন্ন হইতে চায় তাহা হইলে একজনকে অপরের সম্পত্তি কিনিয়া লইতে হইবে।

* Nanavati and Anjaria : The Indian Rural Problem p. 40

(ঘ) যে জমি হইতে লাভ হয় না, তাহাকে কর হইতে সাময়িক ভাবে রেহাই দেওয়া হইবে।

গ্রাম্য ঋণ

আরও যে বিষয়টির প্রতি এখনই দৃষ্টি দিতে হয় তাহা হইতেছে গ্রামের প্রচণ্ড ঋণভার। যদিও গ্রাম্য মহাজন গ্রামের অর্থনীতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল তথাপি তাহার অদম্য লোভ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির হিসাব মতে ১৯২৯ সালে ভারতের কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের হিসাব মতে ১৯৩৭ সালের কৃষিঋণের পরিমাণ ১৮০০ কোটি টাকা। গ্রামের মহাজনের সুদের হার ছাড়াও এই ঋণের জন্য বিনা আয়ের জমি, কুটীর-শিল্পের অবনতি, গবর্ণমেণ্টের রাজস্বনীতি, এবং উৎপন্নের হার কমিয়া যাওয়াও দায়ী।

যদি কৃষকদের বর্তমান কষ্ট ও দারিদ্র্য দূর করিতে হয় তাহা হইলে এই ঋণের বোঝা লাঘব করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে ঋণলাঘব আইন ও ঋণশালিসী বোর্ড স্থাপন করিয়া এই সমস্যা সমাধানের কিছু কিছু চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এই জটিল সমস্যার উপরিভাগ মাত্র স্পর্শিত হইয়াছে। আরও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন। নীচে কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া গেল:

(ক) বিশেষ বিচারক মণ্ডলীদ্বারা সব রকম ঋণ পরীক্ষা করা হইবে। অন্যায় ও মিথ্যা ঋণ নাকচ করা হইবে। অন্যান্য ঋণও কঠোরভাবে শ্রেণীভাগ করা হইবে।

(খ) যে ঋণের দশ বৎসর ধরিয়া নিয়মিত সুদ দেওয়া হইয়াছে তাহা শোধ হইল বলিয়া ধরিতে হইবে।

(গ) ২০ বৎসরের জন্য বণ্ড বিক্রয় করিয়া কৃষককে তাহার ঋণ শোধ করিতে রাষ্ট্রের সাহায্য করা উচিত। কৃষককে সুবিধাজনক শর্তে এই কুড়ি বৎসরে ঋণ শোধ করিতে বলা হইবে।

(ঘ) অল্প সুদে দীর্ঘদিনের জন্য কৃষককে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা করা হইবে পঞ্চায়েতের, সমবায় সমিতি, অথবা জমি-বন্ধকি ব্যাঙ্কের মারফতে, সুদের পরিমাণ কখনই শতকরা ৬ টাকার বেশী হইবে না।

(ঙ) ব্যক্তিগত ভাবে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। কেবলমাত্র গ্রাম্য পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি অথবা জমি-বন্ধকি ব্যাঙ্কই এই কাজ করিতে পারিবে।

(চ) ঋণের পরিবর্ত্তে জমি হস্তান্তর বন্ধ করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে। কৃষকেরা এই জন্য তাহাদের দীর্ঘদিনের ঋণের একাংশ শোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা অত্যন্ত সাময়িক, কাজেই দীর্ঘ সময় লইয়া এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই কৃষি ঋণ-সমস্যা, ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার সহিত জড়িত। কৃষিঋণ বন্ধ করিতে হইলে কৃষির উন্নতিও কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া সাধারণ কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।

ভূমি উদ্ধার-করণ ও ভূমিক্ষয় নিবারণ

শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য কৃষি-যোগ্য পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই জমির পরিমাণ [illegible] কোটি একর। এই জমি চাষ করিবার পথে কতকগুলি বাস্তব বাধা আছে। পুঁজির অভাব, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, সস্তা [illegible] যানবাহনের অভাব, পয়ঃপ্রণালীর অসুবিধা প্রভৃতি কয়েকটি বাধা। কাজেই ভূমি-উদ্ধারের কাজ ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় টাকা এই কাজে ব্যয় করিতে হইবে।

চাষ বাড়ানো ছাড়া আরও একটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যদিও গুরুতর তথাপি এ পর্য্যন্ত এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সমস্যাটি হইতেছে ভূমিক্ষয় নিবারণ। যদি বন সৃষ্টি করিয়া ও বাঁধ দিয়া এ আপদ দূর করিবার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ একর জমি ধুইয়া গিয়া চিরতরে চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িবে।

জলসেচ

চাষের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করা ছাড়াও, এখন যে জমিতে চাষ হয় তাহাতে আরও অধিকমাত্রায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিতে হইবে। এই জন্য জলসেচ বৃদ্ধি করা দরকার। ১৯৩৯-৪০ সালে ২৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর চাষের জমির মধ্যে মাত্র ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল।—তাহার মধ্যে ২ কোটি ৯ লক্ষ একর

জমিতে নালা, ৫৯ লক্ষ একর জমিতে পুকুর, ১ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমিতে কূপ ও ৬৫ লক্ষ একর জমিতে অন্যভাবে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। ইহার অর্থ এই যে মোট চাষের জমির মাত্র শতকরা ২৩ ভাগের জলসেচের ব্যবস্থা থাকে। বাকি জমি নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। এই দিক হইতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক এবং জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

কৃষির কর্মকুশলতা

উপরে যে সকল উন্নতির কথা আলোচনা করা হইল, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :

(ক) ভাল সার—নীচের হিসাব হইতে বোঝা যাইবে দেশের জমির উর্ব্বরতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।*

	চাউল			গম		
	বাংলা	বিহার	মধ্যপ্রদেশ	বম্বে	বাংলা	মধ্যপ্রদেশ
১৯৩১-৩২	৯৬১	৯১২	৭১৮	৪৩০	৫২৫	[illegible]
১৯৪০-৪১	৬৫২	৫১৯	৪১৯	৩৮৫	৪৫১	২৯৭
হ্রাস	৩০৯	৩৯৩	২৯৯	৪৫	৭৪	৩২

কাজেই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রামাঞ্চলে গোবরের মত মূল্যবান সার হয় পোড়াইয়া ফেলা হয় কিম্বা আদৌ সংগ্রহ না করাতে নষ্ট হয়। জ্বালানির অন্য ব্যবস্থা করিয়া এই অবস্থা দূর করিতে হইবে। গ্রামে যে সব জায়গায়

*Estimates of area and yield of principal corps in India, 1940-41

পতিত জমি আছে সেখানে জ্বালানি কাঠের গাছ লাগাইতে হইবে। নদী ও নালার ধারে গাছ লাগাইলে জ্বালানি পাওয়া যাইবে, উপরন্তু ভূমিক্ষয় নিবারিত হইবে। গৃহপালিত পশুর মূত্র নষ্ট হয় এবং মানুষের মল ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংস্কার আছে। গ্রামে যদি নালা-পায়খানা প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে চাষীরা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে অনেকটা সক্ষম হইবে। মৃত পশুপক্ষীর হাড় আজকাল চালান দেওয়া হয়, চাষীরা সার হিসাবে তাহার মূল্য জ্ঞাত নহে।

কৃত্রিম সার প্রস্তুত ব্যাপারে রাষ্ট্রের মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং উহা মৌলিক শিল্প হিসাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু কৃত্রিম সার তৈয়ারী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, গ্রামে গোবর, মল ও হাড় হইতে সার তৈয়ারী করা যায় কি না দেখিতে হইবে।

(খ) গবাদি পশুর উন্নতি বনাম যন্ত্র—আমাদের দেশের প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ্ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া কৃষির উন্নতির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যন্ত্রচালিত কৃষির সুবিধার কথা চিন্তা করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যন্ত্রের চালনার খরচ বেশী, রক্ষার খরচ কম, এবং পশু চালিত কৃষিতে চালনার খরচ কম, রক্ষার খরচ বেশী। অর্থাৎ যখন যন্ত্র কৃষি কার্য্যে প্রয়োগ করা হয় তখন অনেক খরচ লাগে। কিন্তু যন্ত্রের যখন কাজ নাই তখন খরচ খুবই কম। পশ্বাদির বেলায় কৃষির সময় নূতন করিয়া কিছু খরচ করিতে হয় না বটে তবে পশু পালন করিবার জন্য সব সময়েই খরচ আছে। "এই জন্য অল্প সময়ে যখন অনেক কাজ করিতে হয় তখন ট্রাক্টর ব্যবহার খুব সুবিধাজনক। সারা বছর ধরিয়া যদি একই ভাবে কাজ করিতে হয় তাহা হইলে পশু চালিত কৃষিই ভাল।"*

*European conference on Rural life 1939—Document No. 5, p. 20

ভারতবর্ষে জমির আকার ছোট, কাজেই যন্ত্রের প্রয়োগ লাভজনক হইবে না। অবশ্য কৃষির জন্য উন্নত ধরণের হস্তচালিত যন্ত্রের প্রয়োজন সর্ব্বদাই হইবে, বিশেষ করিয়া সমবায় কৃষি প্রবর্ত্তনের পরে।

(গ) গবাদি পশু রক্ষা—যেহেতু যন্ত্রের প্রয়োগ ভারতবর্ষে সম্ভব নহে, সেইজন্য গবাদি পশুর বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নতি বিধান প্রয়োজন। এই দিক হইতে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গো-সংরক্ষণ প্রয়োজন কারণ ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে পশু একটি বিশেষ সম্পদ। পশু-সংরক্ষণ দ্বারা চাষের, জলসেচের ও যানবাহনের জন্য বলদ, সারের জন্য গোবর এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুষ্টিকর দুধ পাওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত কারণে মহিষ লাভজনক নহে :†

(ক) পুরুষ শাবক কৃষির কোন কাজে লাগে না।

(খ) গরু অপেক্ষা মহিষের ব্যারাম বেশী হয়।

(গ) মহিষের বেশী তদারক করিতে হয়; চরিবার অনেক জায়গা এবং জলাভূমি না থাকিলে মহিষের চলে না। সাধারণ কৃষকের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

গো-সংরক্ষণের জন্য ভাল ষাঁড়, ডেয়ারি প্রতিষ্ঠা, গোচারণভূমি ও পশুভোগ্য তৃণের চাষ কয়েকটি প্রধান বিষয় হইবে।

(ঘ) কৃষি যন্ত্রের উন্নতি—যদিও পাশ্চাত্যের মত কৃষিতে যন্ত্রপ্রয়োগ ভারতে প্রয়োজন নাই, তথাপি হস্ত ও পশুচালিত যন্ত্রাদির উন্নতির দরকার আছে। বর্ত্তমানে কৃষকেরা অতি প্রাচীন হাল ও মই ব্যবহার করে। এইগুলি উন্নত ধরণের হওয়া দরকার।

(ঙ) ভাল বীজ—'যেমন বপন করিবে ফসলও হইবে তেমনি' এই

† Harijan 24-10-1936

উক্তিটি প্রাচীন। যদি কৃষির ফসল বাড়াইতে হয় তাহা হইলে ভাল বীজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) কৃষি বীমা—ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের মত ভারতবর্ষের কৃষকদেরও বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, ও পশুমরকের জন্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বীমা করা প্রয়োজন। কৃষকেরা ফসল দিয়া তাহাদের দেয় অংশ শোধ করিবে। কৃষি বীমার দায়িত্ব থাকিবে প্রাদেশিক সরকারের।

(ছ) সমবায়—সর্ব্বোপরি কৃষির উন্নতির আশা নির্ভর করে সমবায় প্রচেষ্টার উপর। 'সকলের জন্য প্রত্যেকে আমরা এবং প্রত্যেকের জন্য সকলে' এই অনুভূতি গ্রামের লোকের মনের ভিতর ঢুকাইয়া দিতে হইবে। সমবায় চাষ, সমবায় বিক্রয় ও সমবায় ঋণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতবর্ষে সমবায় অকৃতকার্য্য হইবার প্রধান কারণ সমবায় নীচ হইতে গড়িয়া উঠে নাই। গ্রাম্য সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা,—এই সমাজই ছিল আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠান,—ভারতের কৃষির উন্নতি হইতে বাধ্য।

কৃষি-সংশ্লিষ্ট শিল্প

পশু পালন

পশু সম্পদে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। ব্রহ্মদেশ ও করদ রাজ্যগুলি সমেত ১৯৩৫ সালের সেন্সাসের হিসাবে দেখা যায় গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ৩৬ কোটি। গরু ও মহিষ যথাক্রমে ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ ও ৪ কোটি ৭০ লক্ষ। কিন্তু গুণ বিচারে এই পশু অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং

তাহাদের দুধের পরিমাণও অত্যন্ত কম। কি কারণে এই পশুগুলি এত হীন পর্য্যায়ের হইয়া পড়িল নীচে তাহা বিবৃত হইল :

(ক) পশুভোগ্য তৃণের অভাব। খাদ্য ও তৃণের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চাষ করা বাঞ্ছনীয়। গ্রামে গোচারণ ভূমি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(খ) অবৈজ্ঞানিক পশু-প্রজনন ও ভাল ষাঁড়ের অভাব।

(গ) পশুপালন সংশ্লিষ্ট শিল্পের অভাব যথা ডেয়ারি, ট্যানিং, চামড়ার কাজ, হাড়ের কাজ ইত্যাদি। এই সব শিল্প বাড়িয়া উঠিলে পশু সংরক্ষণ আরও লাভজনক হইবে এবং তখন পশুদিগের আরও যত্ন লওয়া হইবে।

ডেয়ারি

ডেয়ারি পণ্যের বাৎসরিক মূল্যের হিসাব করা হইয়াছে [illegible] কোটি টাকা। কাজেই ডেয়ারি যে শুধু কৃষকের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবে তাহা নহে। যথোপযুক্ত খাঁটি দুগ্ধের সমস্যাও দূর করিবে। মোট দুগ্ধের পরিমাণ অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ আমেরিকার কাছাকাছি। গ্রেটবৃটেনের চারগুণ, ডেনমার্কের পাঁচগুণ, অষ্ট্রেলিয়ার ছয়গুণ দুধ ভারতবর্ষে হয়। তাহা সত্ত্বেও মাথাপিছু দুধের পরিমাণ হিসাবে ভারতবর্ষ সকল দেশের নীচে।* মাথাপিছু কতখানি দুধ ব্যয় হয় নীচে তাহার হিসাব দেওয়া হইল

* Report on the Development of the cattle and Dairy Industries in India—N. C. Wright

নিউজিল্যাণ্ড—	৫৬ আউন্স	
অষ্ট্রেলিয়া—	৪৫	,,
ডেনমার্ক—	৪০	,,
গ্রেটবৃটেন—	৩৯	,,
আমেরিকা—	৩৫	,,
ভারতবর্ষ—	৭	,, *

ডাঃ রাইটের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের দুধের হিসাব কয়েক বৎসরে দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে হইবে।

এই জন্যই উচিত ভারতবর্ষের গ্রামে ও সহরে সমবায় প্রথায় ডেয়ারি প্রতিষ্ঠা করা। নিখিল ভারত গো-সেবাসঙ্ঘ গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ডেয়ারি প্রতিষ্ঠার মত কঠিন অথচ প্রয়োজনীয় কার্য্যটি সেবাগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সামান্য একটি গোয়ালঘর তুলিয়া গ্রামের সকলে নিজ নিজ গোরু সেইখানে রাখিয়া একটি সমবায় ডেয়ারি গড়িয়া তুলিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ভাল ষাঁড় বলদ কেনাও সম্ভব। এই ডেয়ারি পরিচালনার ভার পালাক্রমে দেওয়া হইবে। দুধ ছাড়া ঘি, মাখন ও ননী তৈয়ারী হইতে পারে। দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যে ভেজালের সমস্যার প্রতি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। দুধের কথা বিচার করিলে নিম্নলিখিত কারণে মহিষ অপেক্ষা গোরু ভাল: †

১। মহিষ গোরু অপেক্ষা এক বৎসর পরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়

২। একবার দুধ বন্ধ হইবার পরে বাচ্চা দিবার সময়ের ব্যবধান মহিষের গোরু অপেক্ষা তিন গুণ

৩। একটি ভাল গোরু মহিষের চাইতে বেশী দুধ দেয়

* Hirijan, 15-2-1942

† হয়ত সঠিক পরিমাণের বেশি ধরা হইয়াছে।

৪। শীতাতপে মহিষ গোরু অপেক্ষা অধিক কাতর হয়, ফলে দুধের পরিমাণও গোরুর চাইতে কমিয়া যায়। মহিষ রাখিবার পক্ষে একমাত্র যুক্তি যে মহিষের দুধে স্নেহের পরিমাণ বেশী। কিন্তু একটি ভাল গোরু এই দিক দিয়া মহিষকেও হারাইয়া দেয়। গোরুর দুধে মহিষের দুধের চাইতে ভিটামিন বেশী :

	এ	বি	সি	ডি	ই
গোরু	XXX	XX	X	X	X
মহিষ	XXX	X	X	X	

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে গোরুর দুধে বি ভিটামিন বেশী এবং মহিষের দুধে আদৌ ই ভিটামিন নাই।

ট্যানিং ও চামড়ার কাজ

ডেয়ারি ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে অথবা পরগণায় ট্যানারি স্থাপন করিয়া স্যাণ্ডেল, জুতা, সুটকেশ ও অন্যান্য চামড়ার জিনিস তৈয়ারী করা উচিত। গ্রামের মৃত পশুর চামড়া এই ভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে। হিসাবে দেখা যায় যে গড়ে প্রতি বৎসর ১ কোটি ৩০ লক্ষ পশু মারা যায়। বর্ত্তমানে মৃত পশু মালিকের একটি বোঝা বিশেষ, স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাহাকে কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। চামারেরা চামড়া লয়। কিন্তু মৃত পশুর অবশিষ্টাংশ স্থানীয় লোকের কাছে আবর্জ্জনা। চামারেরা যে অপটু উপায়ে চামরা পাকা করে তাহা বৈজ্ঞানিক উপায় নহে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যদি গ্রামে ট্যানারি স্থাপন করা যায় তাহা

হইলে গ্রামে অতিরিক্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে। মৃত পশুর লোম, হাড়, দাঁত, খুর, চর্বি, রক্ত ও নাড়ী দিয়া নানা রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইতে পারে। ওয়ার্দ্ধাতে নলওয়াড়ী আশ্রমের ট্যানারিতে সকল পরীক্ষা এখন চলিতেছে।*

ফলের চাষ

ভারতবর্ষে ফলের চাষ অবহেলিত। যতদূর হিসাবে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা গিয়াছে মাত্র ২৫ লক্ষ একর জমিতে ফলের চাষ হয়। বিভিন্ন আবহাওয়া থাকিবার জন্য পৃথিবীতে জাত সকলপ্রকার ফলই ভারতবর্ষে হয়। কিন্তু ফলের চাষ এখন অশিক্ষিতদের হাতে। কৃষি ও ডেয়ারির পাশে পাশে যদি ফলের বাগান করা হয় তাহা হইলে তাহাদের আহারের জন্য তাজা ফল ত পাইবেই, তাছাড়া তাহাদের আয়ও অনেক বাড়িয়া যাইবে।

ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে আমাদের গ্রামাঞ্চলে ফল সংরক্ষণ ও বোতলবন্দী করিবার জন্য শিল্প গড়িয়া উঠিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সব্জীর চাষ

শাকসব্জীর পুষ্টিকর ক্ষমতা কিছুতেই বাড়াইয়া বলা হয় না। এই দিকে উন্নতির যথেষ্ট পথ রহিয়াছে।

* দুঃখের বিষয় ট্যানারিটি এখন গভর্নমেন্টের অধিকারে।

বনজ শিল্প

মোট বনের পরিমাণ ৮ কোটি ৯ লক্ষ একর জমি। বৃটিশ ভারতের ইহা ⅕ অংশ। বনজ সম্পদের কি আর্থিক সম্ভাবনা আছে তাহা এখন পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা হয় নাই। কাগজের মণ্ড, তার্পিন তেল, আঠা, শিরীষ ও রঞ্জক দ্রব্য তৈয়ারীর জন্য শিল্প গড়িতে হইলে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

কুটীর শিল্প

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বলা হইয়াছে যে জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের যত অধিক সম্ভব সাচ্ছল্য সাধন করা, বিশেষ করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সাচ্ছল্য সাধন ব্যাপারে একক-নির্ব্বাচন বিভিন্ন শিল্পের বেলায় বিভিন্ন রকমের হইবে। কোনও ক্ষেত্রে গ্রাম অথবা তালুক; কোথাও বা জেলা অথবা বিভাগ এমন কি প্রদেশকে সাচ্ছল্যের একক হিসাবে ধরিতে হইবে। নিম্নলিখিত শিল্পগুলি গ্রাম্য অর্থনীতির দিক হইতে বিশেষ স্থান অধিকার করিবে:

(ক) খাদি—অতি প্রাচীন কাল হইতে সুতাকাটা ও বয়ন ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্প। ২০০০ খৃষ্টপূর্ব্বের পিরামিড হইতে প্রাপ্ত

মমি ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম মসলিন পরিহিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সূতাকাটা ও বয়ন সম্বন্ধে উক্তি রহিয়াছে। ভারতের হাতেকাটা ও হাতে-বোনা সূতা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রশংসা ও আদর পাইয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের রাজরমণীরা ভারতীয় সিল্ক ব্যবহারে পুলকিত হইতেন। ৭৩ খৃষ্টাব্দে প্লিনি ভারতবর্ষের বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রব্যবসা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিশেষ করিয়া ঢাকার মশলিনের প্রশংসা করিয়াছেন। ফরাসী পরিব্রাজক ট্যাবেরনিয়ের সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ছয়বার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি Travels in India নামক পুস্তকে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে রাজদূত হিসাবে পারস্যে ফিরিয়া "উটপাখীর ডিমের আকারের একটি নানা রত্নসজ্জিত নারিকেল শাহ সাফিকে উপহার দেন। খুলিলে দেখা গেল উহাতে ৬০ হাত লম্বা একটি পাগড়ী রহিয়াছে। পাগরীটি এত সূক্ষ্ম মশলিনে তৈরী যে হাতে রাখিলে বোঝাই যায় না যে হাতে কিছু আছে।" এমন কি বৃটিশ আমলের পূর্ব্বেও চাষীরা আয় বাড়াইবার জন্য কিছুটা সময় সূতা কাটিত ও কাপড় বুনিত। এই প্রকাণ্ড জাতীয় শিল্প কি ভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুকৌশলে ধ্বংস করিয়াছে সে কাহিনী অতীব করুন। কি ভাবে ঢাকার তাঁতিরা কোম্পানীর লোকের অত্যাচারে তাহার অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলে সে কাহিনী দেশের লোকে কোনও দিন বিস্মৃত হইবে না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই অংশ বিশদ ভাবে বর্ননা করিতে যাওয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে আমাদের দেশের বৃটিশ বণিকের আগমনের পূর্ব্বে খাদি একটি সমৃদ্ধ শিল্প ছিল। সূতাকাটা

এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। মিলের সূতা তাঁতে বোনা এখনও চলে। তাঁতিদের মিলের উপরে এই নির্ভরশীলতায় অনেক বিপদ আছে। মিলমালিকেরা যুক্তি করিয়া একটি পন্থা অবলম্বন করিলে একদিনে তাঁতিরা উৎখাত হইয়া যাইবে।

গান্ধীজির অক্লান্ত চেষ্টায় আবার ধীরে ধীরে জাতীয় খাদি শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের কাজ সত্যই প্রশংসার্হ। ১৩৪০ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে ৯৫,৫১,৪৭৮ গজ খাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ২,৭৫,০০০ কাটুনী ও তাঁতি ১৩,৪৫১টি গ্রামে ছড়াইয়া আছে। এই কাটুনী ও তাঁতিরা মোট পারিশ্রমিক পাইয়াছে ৩৪,৮৫,৬০৯৲ টাকা।

"কিন্তু খাদির উদ্দেশ্য ইহা নয় যে সহরের লোককে এমন বাহারের খদ্দর জোগান দিবে যা মিলের কাপড়ের সহিত টক্কর দিতে পারে। এই ভাবে যে শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা তাহাতে অতি অল্প কর্ম্মীরই কাজের সংস্থান হইবে। খাদির উদ্দেশ্য পল্লী-পরিপূরক শিল্প হিসাবে গড়িয়া ওঠা। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে একটু কঠোরতা সহ্য করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে খদ্দরের ব্যবহার চালু করিতে হইবে। গাঁয়ের লোকে যেমন নিজের আহার্য্য নিজেরাই রান্না করে তেমনি তাহাদের নিজের প্রয়োজনীয় খদ্দর নিজেদেরই তৈয়ারী করিতে হইবে। যদি বাঁচে তবে তাহা বিক্রয় করা চলিতে পারে।"*

আমি নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ হইতে যে হিসাব পাইয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রত্যেক গ্রাম যে শুধু আপনার প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপন্ন করিতে পারে তাহা নয়; অতিরিক্ত খদ্দর

* Economics of Khadi p. XIV (Introduction)

সহরের লোকের জন্য সরবরাহ করাও গ্রামের পক্ষে সম্ভব। হিসাবটি নিম্নরূপ :

ভারতবর্ষের গ্রামের গড়পরতা জনসংখ্যা ৫০০ শত। মাথা পিছু বৎসরে ২০ গজ করিয়া ধরিলে প্রত্যেক গ্রামের ১০,০০০ গজ খদ্দর প্রয়োজন। এক বর্গগজ খদ্দর বুনিতে চার 'গুঁড়ি' সূতা লাগে। এই হিসাবে একটি গ্রামের জন্য ৪০,০০০ 'গুঁড়ি' সূতা লাগিবে। একজন লোকের ১৬ নম্বরের এক 'গুঁড়ি' সূতা কাটিতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে ধরা যাক। তাহা হইলে সমগ্র গ্রামের ১২০,০০০ ঘণ্টা সূতা কাটিতে হইবে। শিশু, অশক্ত ও রোগী প্রভৃতি গ্রামের কতকরা ২৫ জন ধরিলে সমগ্র গ্রামের জন্য ৩৭৫ জন লোককে সূতা কাটিতে হইবে। তাহা হইলে একজন লোককে বছরে মাত্র ৩২০ ঘণ্টা সূতা কাটিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে যদি প্রত্যেকটি সমর্থ লোক বৎসরের প্রতিদিন একঘণ্টা করিয়া সূতা কাটে তাহা হইলে গ্রামের প্রয়োজনীয় কাপড় তাহারা অনায়াসে উৎপাদন করিতে পারে। চেষ্টা করিলে গ্রামবাসীরা, মেয়েরা, মৌলিক স্কুলে শিশুরা দিনে গড়ে দুই ঘণ্টা সূতা কাটিতে পারে। এইভাবে ভারতবর্ষের গ্রাম যে নিজের কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে পারে শুধু তাহা নহে, সহরের জন্য কিছু কিছু কাপড় জোগান দেওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব।

খদ্দর বুনিবার উপাদান খুব সস্তা। তাঁতিরা বৎসরে ৬,০০০ 'গুঁড়ি' সূতার কাপড় বুনিতে পারে। একটি গ্রামে সাতজন তাঁতি থাকিলেই যথেষ্ট।

(খ) কাগজ তৈয়ারী—আহার্য্য, বাসস্থান ও কাপড়ের পরে আধুনিক জীবনে কাগজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এই দিক হইতে দেখিলে কুটীর-শিল্প হিসাবে কাগজ

তৈয়ারীর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সভা নানা প্রদেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই শিল্প গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। কাগজ তৈয়ারী অত্যন্ত সহজ শিল্প, বাড়ীর মেয়ে ও শিশুরাই উহা পারে। কলের কাগজের সঙ্গে হাতে তৈয়ারী কাগজ প্রতিযোগিতা করিবে ইহা কাম্য নহে। তবে এই শিল্প হইতে গ্রামবাসীরা কিছু আয় বাড়াইতে পারে। এই সব কাঁচা মাল কাগজ তৈয়ারীর কাজে লাগিতে পারে—পরিত্যক্ত তুলা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, শণ, তিসির ছাল, পাটের খোঁসা, খড়, ছেঁড়া কাগজ এবং ঘাস।

(গ) তৈল নিষ্কাষণ—তেলের কল হওয়া সত্ত্বেও দেশজ ঘানি এখনও বেশ চলিতেছে। এই শিল্পের জন্য উপাদান বিশেষ কিছুই লাগে না। ঘানির তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে গ্রামের লোকের যে শুধু আয় বাড়িবে তাহা নহে, অনেক বেশী পুষ্টিকর তৈলও গ্রামবাসীরা পাইতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে মিলের তেলে ঘানির তেল অপেক্ষা ভিটামিন কম। নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সমিতি বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবহৃত ঘানির উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যদিও মিলের তেল ঘানির তেল অপেক্ষা সস্তা, তথাপি গ্রামবাসীদের নিজেদের স্বার্থের জন্যই ঘানির তেল ব্যবহার করা উচিত। কলের তেল ব্যবহারে টাকাটা গিয়া জমে পুঁজিপতিদের পকেটে। ঘানির তেল ব্যবহারে গ্রামবাসীদের কাজের সংস্থান হয়।

নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সমিতি একপ্রকার লণ্ঠন উদ্ভাবন করিয়াছে নাম 'মগন দীপ' এই লণ্ঠনে তিল এবং তিসির তেল জ্বলে। তৈল নিষ্কাষণ শিল্প গড়িয়া উঠিলে লণ্ঠনে কেরোসিন তেলের ব্যবহারও উঠিয়া যাইবে।

(ঘ) ধান ভানা—অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কলের চাউলের পুষ্টিকর ক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়। ভারত গভর্ণমেণ্টের ২৮ নং স্বাস্থ্য বুলেটিনে দেখান হইয়াছে যে মিলে চাউল পালিশ করিলে উপরের আবরণ তুলিয়া যায়। এই আবরণেই বেশী প্রোটিন, খনিজ লবন, এবং ভিটামিন থাকে। ভিতরে থাকে স্টার্চ। ভিটামিন 'বি'র অভাবে কঠিন প্রতিক্রিয়া হয়। কলে ছাঁটা চাউলে ভিটামিন 'বি'র অভাবই বেরিবেরির কারণ। ঢেঁকি ছাঁটা চাউলে প্রোটিন, ফস্ফোরাস, ক্যালসিয়াম ও লৌহের ভাগ কলে ছাঁটা চাউলের অপেক্ষা বেশী। আঁকাড়া চাউল কলে ছাঁটাই ও ঢেঁকি ছাঁটাই—দুইটিতে একই রকম খরচ। কাজেই খরচের দিক হইতে দেখিলে ঢেঁকি ছাঁটা চাউল প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দুঃখের বিষয় কলে ছাঁটা চাউল ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে, বহু লোকে কর্ম্মহীন হইয়াছে। অতএব রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য চাউলের কল তুলিয়া দেওয়া, অন্ততপক্ষে বিক্রয়ের স্থান নিয়ন্ত্রিত করা। রাষ্ট্রের দেখা উচিত যে মিলে এখনকার মত যেন চাউল পালিশ না করা হয়। চাউল দেশের অধিকাংশের প্রধান খাদ্য, কাজেই এই সমস্যাটি রাষ্ট্র এড়াইয়া যাইতে পারে না। আমার বক্তব্য নীচের হিসাব* হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে :—

	ঢেঁকি ছাঁটা	কলে ছাঁটা	শতকরা ক্ষতি
ফস্ফোরাস	০·২৩	০·১৩	৫৪
ক্যালসিয়াম	০·০৪৩	০·০১৩	৭০
বাংলা দেশের চাউলে			
লৌহ	২·২	১·০	৫৫

* Rice, Published by A. I. V. I. A. P 47.

(ঙ) **অন্যান্য বিবিধ কুটীর-শিল্প** :—আখ, খেজুর ও তালের রস হইতে গুড় তৈয়ারী, মৌমাছি পালন, সাবান তৈয়ারী, গমভাঙ্গা, হাঁস মুরগী পালন, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দেশলাই তৈয়ারী, কুমোরের কাজ, খেলনা তৈয়ারী, টালি ও ইট তৈয়ারী, কাঁচের বাসন ও বালা তৈয়ারী।

জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে গুড় তৈয়ারী ও গম ভাঙ্গার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে গুড় চিনির চাইতে পুষ্টিকর এবং জাঁতায় ভাঙ্গা আটায় কলের ময়দা হইতে বেশী ভিটামিন থাকে। কাজেই চিনি ও ময়দার কারখানা নিয়ন্ত্রণ দরকার হইবে।

উপরের তালিকা সম্পূর্ণ বলিয়া দাবী করা হইতেছে না। স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আমাদের দেশে অনেক কুটীর-শিল্প গড়িয়া তোলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রের সাহায্য

পরিকল্পনার কার্য্যক্রমে কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন একটি প্রধান বিষয় বলিয়া রাষ্ট্রের মনে করিতে হইবে। গ্রামের কর্ম্মীদের নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য করিতে হইবে :

(১) সমবায় ঋণ সমিতির মারফতে সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া। কর্ম্মীদের কাঁচা মাল কিনিয়া জমা রাখিবার জন্য এবং তৈয়ারী মাল ধরিয়া রাখার জন্য টাকা দরকার।

(২) শিশু ও বয়স্কদের বিদ্যালয়ে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া।

(৩) কুটীর-শিল্পের যান্ত্রিক কুশলতা ও সমস্তভাবে কুটীর-শিল্পের প্রসারের জন্য গবেষণা আগার স্থাপন।

(৪) গ্রামে যে কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় না, যৌথভাবে তাহা ক্রয় ব্যবস্থা।

(৫) অতিরিক্ত মাল সহরে লাভজনক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য সমবায় ব্যবস্থা।

(৬) বড় বড় কারখানার প্রতিযোগিতা হইতে কুটীর-শিল্পকে রক্ষা করা।

(৭) হাতে তৈয়ারী মালের জন্য ষ্টীমার ও রেলে সুবিধাজনক ভাড়ার প্রবর্তন।

(৮) প্রয়োজন হইলে মিলের উপর কর বসাইয়া কুটীর-শিল্পকে সাহায্য করা।

মৌলিক শিল্প

আমরা বলিয়াছি নিত্য প্রয়োজনের জিনিস কুটীর-শিল্প হইতে সরবরাহ করা হইবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কয়েকটি মৌলিক শিল্প গড়িয়া তুলিবার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। মৌলিক শিল্প কুটীর-শিল্প গড়িয়া উঠিবার পথে বাধা না হইয়া উহার সহায়ক হইবে। নিম্নলিখিত মৌলিক শিল্পগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে ঃ

(১) আক্রমণ প্রতিরোধক শিল্প*

* গান্ধীজি যদিও শান্তি ও অহিংসায় বিশ্বাসী তথাপি তিনি মনে করেন স্বাধীন ভারতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র প্রয়োজন হইবে।

(২) শক্তি উৎপাদন—হাইড্রো এবং থার্মাল বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৩) খনি, ধাতব ও বনজ—লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তৈল ও কাঠ। খনিজ ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে।

(৪) বড় ও ছোট যন্ত্র—বিশেষ করিয়া কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উপযোগী যন্ত্র।

(৫) ইঞ্জিনিয়ারিং—জাহাজ, রেলগাড়ী, মোটর ও বিমান।

(৬) রাসায়নিক—ভারি রাসায়নিক, কৃত্রিম সার, ঔষধ।

বিদ্যুৎ—যুদ্ধ ও বোমার আক্রমণের বিপদ মৌলিক শিল্প ও বড় বড় কারখানা কেন্দ্রবিচ্যুত করিবার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। এইরূপ কেন্দ্রচ্যুত মৌলিক শিল্পে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। এই দিকে সোভিয়েট রাশিয়া, চীন ও জাপানের আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। কৃষির কাজ এবং কুটীর-শিল্পেও কিছু কিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাইতে পারে।* কিন্তু ব্যবহার অত্যন্ত সন্তর্পণে করিতে হইবে, কারণ ইহার ফলে গ্রামের লোকের বেকার হইবার সম্ভাবনা। অনেক দূরের শক্তির উৎস নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্ভাবনা গ্রামের লোকের নাও থাকিতে পারে। কাজেই এই শক্তির উপরে গ্রামের লোকের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি না হওয়াই ভাল।

বিদ্যুৎ শক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ভারতবর্ষে কতটা তাহা এখনও অনুসন্ধান করা হয় নাই। উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা এ দিকে রহিয়াছে। আমাদের দেশে যে কত কম বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে নীচের হিসাবটি দেওয়া গেল।

* 'গ্রামের প্রতিটি গৃহেই বিদ্যুৎ সরবরাহ হইলেও আমি মনে করি না, তাহার সাহায্যেই গ্রামবাসীকে হাতের কাজ করিতে হইবে।'—হরিজন ২২-৬-১৯৩৫

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন (এক মিলিয়ন কিলোয়াট)

দেশ	১৯৩০
আমেরিকা	১২০,০০০
জার্ম্মাণী	৩০,৬৬১
বৃটেন	১৬,৬২০
জাপান	১৩,৯৫৭
অষ্ট্রেলিয়া	২,৪৩৬
ভারতবর্ষ	৯৭৬

জলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিলেই যে তাহা কয়লা হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ অপেক্ষা সস্তা হইবে তাহা মনে করা ভুল। গ্রিড সিষ্টেমে হাইড্রো ইলেকট্রিক উৎপন্ন করিলে বেশী ব্যবহার হইলেও তাহা সস্তা হয়। উপরন্তু হাইড্রো ইলেকট্রিক যন্ত্র বসাইতে খরচ বেশী ও দীর্ঘদিন সময় লাগে। এই দুই প্রকার বিদ্যুতের ব্যবহার স্থানীয় অবস্থা এবং প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিবে।

রাষ্ট্রের মালিকানা—ব্যক্তিগত অথবা সমবার মালিকানার সুযোগ গ্রামের কুটীর-শিল্পে যথেষ্টই থাকিবে। এই গ্রাম্য সঙ্ঘগুলিই গ্রাম ও সহরের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার অন্যতম ভিত্তি ইহাই যে মৌলিক শিল্পগুলি দেশের স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। মৌলিক শিল্পগুলি দেশের সকলের সুবিধার জন্য বলিয়া তাহা ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। কুটীর-শিল্প রাষ্ট্রের অধীনে না থাকিলেও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হইবার সুযোগ বিশেষ থাকিবে না। কাজেই এই পরি-

যানবাহনের মালিক হইবে তখন ঐরূপ প্রতিযোগিতা আপনা হইতেই লোপ পাইবে। গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নতির দিকে এতদিন পর্য্যন্ত আদৌ দৃষ্টি দেয় নাই, কারণ রেলপথেই অধিক লাভে বৃটিশ পুঁজি খাটানো যাইতে পারে। বলা বাহুল্য সে জলপথ অধিক সস্তা এবং সেইজন্য কৃষকের পক্ষে অধিক লাভজনক হইবে।

উপকূলে জাহাজ চলাচল—ভারতবর্ষে ৪০০০ মাইল উপকূলে সস্তায় জাহাজ চালানো যাইতে পারে। এই ধরণের যান-বাহনের প্রচলন করিতে হইলে যে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলি এখন ভারতীয় কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। এমন কি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী গুলিও ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র কিনিয়া লইবে যাহাতে এই যানবাহন জাতীয় স্বার্থে নিয়োগ করা যায়।

উপকূলে জাহাজ পরিচালনা ছাড়াও ভারতবর্ষের বাণিজ্য নৌবহর বৃদ্ধি করিতে হইবে। অতীতে একসময় উহা ভারতের গৌরবের বিষয় ছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে আমরা নিজেদের যানবাহনের উপরে নির্ভর করি তাহাই বাঞ্ছনীয়।

নাগরিক বিমান চালনা—যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিমান চলাচল বৃদ্ধি পাইবে, ভারতবর্ষ এই বৃদ্ধি বাধা দিতে পারিবে না। মাল বহন করিতে বিমান বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইবে না বটে, কিন্তু যাতায়াত ও ডাক বহনের কাজে ইহার জনপ্রিয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে। বিমান বিভাগের মালিক হইবে রাষ্ট্র, এবং তাহা সহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

ডাক ও তার বিভাগের সুবিধা—যোগাযোগের ব্যবস্থা দেশে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। গ্রামের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ডাক,

সাধারণের স্বাস্থ্য

সকলেই স্বীকার করিবে যে ভারতে স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন। বসন্ত, টায়ফয়েড, আমাশয়, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়া সর্ব্বত্র লাগিয়াই আছে। ১৯৩৯ সালের ৬,১৬৫,২৩৪টি মৃত্যুর মধ্যে ম্যালেরিয়া ১,৪১১,৬১৪, বসন্তে ৪৮,১০৩ কলেরায় ৯৭,৫৬৬ এবং আমাশয়ে ২৬০,৩০০ জন মারা গিয়াছে।* প্রতি বৎসর যক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে, বছরে বছরেই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। পুষ্টির অভাবজনিত অসুখ ত সর্ব্বত্রই। একদল বৃটিশ সাংবাদিক সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষ 'জীবাণুদের স্বর্গ'।

আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের করুণ অবস্থা নীচের হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

জীবনের মেয়াদ (বৎসরের হিসাব)

	পুরুষ	স্ত্রী
আমেরিকা	৬০'৬০	৬৪'৫০
বৃটেন	৬০'১৮	৬৪'৪০
জার্ম্মাণী	৫৯'৮৬	৬২'৮১
অষ্ট্রেলিয়া	৬৩'৪৮	৬৭'১৪
জাপান	৪৬'৯২	৪৯'৬৩
ভারতবর্ষ	২৬'৯১	২৬'৫৬

ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যের উন্নতি দুই রকমে করিতে হইবে:

(১) প্রতিরোধক ব্যবস্থা—জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, গৃহ ব্যবস্থা, সূতি আগার, শিশু মঙ্গল প্রভৃতি।

(২) নিরাময়ের ব্যবস্থা—হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের মারফতে চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

জনস্বাস্থ্য, জলসরবরাহ এবং গৃহব্যবস্থা: "শ্রম হইতে বুদ্ধি বিচ্যুত হওয়াতে গ্রাম সম্বন্ধে সকলে অপরাধজনকভাবে উদাসীন। তাই চমৎকার সাজানো গ্রামের পরিবর্ত্তে আমরা আবর্জ্জনার স্তূপ দেখিতে পাই। অনেক গ্রামেই প্রবেশের অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক নহে। চারিদিকে এতই ময়লা ও দুর্গন্ধ যে নাক চোখ বন্ধ করিতে হয়।"* এই কারণেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি ভালভাবে শিখাইতে হইবে। এই শিক্ষা মৌলিক ও তালিমী শিক্ষার অন্তর্গত হইবে। ময়লা আবর্জ্জনার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িবার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ত হইবেই, উপরন্তু খুব ভাল সারও পাওয়া যাইবে। গর্ত্ত পায়খানার ব্যবহার শিখাইতে হইবে। সহরের মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

গ্রামে ও সহরে জল সরবরাহ বাড়াইতে হইবে এবং তাহা আরও উন্নত করিতে হইবে। হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৯ সালে বৃটিশ ভারতের ১,৪৭১টি সহরের মধ্যে মাত্র ২৫৩টি সহরে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। ইহা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট নহে। গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয়। নোংরা ভরা পুষ্করিণীর জল পান ও স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়। জন্তু ও মানুষে একইভাবে, একই জায়গা হইতে প্রয়োজনীয় জল ব্যবহার করে। ইহার ফলে নানারকম মহামারি দেখা দেয়।

আলো-হাওয়া যুক্ত পরিচ্ছন্ন উন্নত বাসগৃহের কথা বাদ দেওয়া যায় না। রাষ্ট্র গ্রাম সমিতি অথবা পঞ্চায়েতের কাছে গ্রামবাসীদের

অনুসরণের জন্য আদর্শ গৃহের মডেল দিবে। সমবায় গৃহনির্ম্মাণ সমিতি এই দিকে অনেক কাজ করিতে পারে। আয় বাড়িলে গ্রামবাসীরা বাসগৃহের উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারিবে।

প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল—নীচের হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী—

	হাজারটি জন্মের মধ্যে	
ভারতবর্ষ	১৬৭	মৃত্যু
জাপান	১১৪	"
কানাডা	৬১	"
জার্ম্মানী	৬০	"
বৃটেন	৫৩	"
আমেরিকা	৪৮	"
অষ্ট্রেলিয়া	৩৮	"

মৃত্যুর হার এত বেশী হইবার কারণ অংশত বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের ফলে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কিন্তু মূল কারণ নিঃসন্দেহে জনগণের কঠোর দারিদ্র্য।

ভারতবর্ষে মৃত্যুহারের ব্যাপারে একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে সন্তান ধারণোপযোগী নারীদের অধিক সংখ্যায় মৃত্যু। অনেক মেয়েই প্রসবের সময় অথবা প্রসবান্তে যক্ষ্মা হইয়া মারা যায়।

অতএব জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার সাধারণ সমস্যা ছাড়া সহরে ও গ্রামে অসংখ্য প্রসূতি আগার স্থাপন করা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য হইবে। এই সব প্রসূতি আগার হইতে মেয়েদের

সন্তান পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রসূতিমঙ্গলের ব্যবস্থাই বোধ হয় পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আখড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা—রোগ প্রতিরোধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় যে জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা এ কথা ভুলিলে চলিবে না। দেশের সর্ব্বত্র অসংখ্য আখড়া প্রতিষ্ঠা করিলে এই দিক হইতে ফল পাওয়া যাইবে। স্বদেশী খেলাধূলা ব্যয়সাপেক্ষ নহে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও তাহা ভাল। এইগুলিকে উৎসাহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

হাসপাতাল ও গ্রামের ঔষধালয়ঃ রোগ নিরাময়ের জন্য সহরে উন্নততর হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দিক হইতেও সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মাত্র ৭০০০ হাসপাতাল ও ঔষধালয় আছে। চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ৪২,০০০ অর্থাৎ প্রতি ৯০০০ লোকের জন্য একজন করিয়া ডাক্তার। জাপানের জনসংখ্যা প্রায় বাংলা দেশের সমান, সেখানকার ডাক্তারের সংখ্যার চাইতেও ভারতের ডাক্তারের সংখ্যা কম। যদি প্রতি ২০০০ লোকের জন্য একজন ডাক্তারের প্রয়োজন বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষে মোট ২০০,০০০ জন ডাক্তার প্রয়োজন। নার্সের সংখ্যা মোটে ৪৫০০ অর্থাৎ ৮৬,০০০ লোকের জন্য মাত্র একজন নার্স। গ্রেট বৃটেনে ভারতের এক অষ্টমাংশ জনসংখ্যা, সেখানে ১০৯,৫০০ জন নার্স ও ৬১,৪২০ জন ডাক্তার আছে; অর্থাৎ ৪৩৫ জন লোকের জন্য একটি নার্স ও ৭৭৬ জন লোকের জন্য একজন ডাক্তার আছে।

এই কাজের জন্য শিক্ষিত লোকের সমস্যাটি গুরুতর; গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে এই সমাধান করিতে

হইবে। পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাধীনে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া ঔষধালয় থাকিবে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাহার তদারক করিবেন।

চিকিৎসার প্রণালী : ভারতবর্ষের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার সময় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইবে দেশজ আয়ুর্ব্বেদিক ও য়ুনানী চিকিৎসার প্রশ্রয় দেওয়া। এই সব দেশজ চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতির জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সব গ্রামের পক্ষে এ্যালোপাথি চিকিৎসার ব্যয় বহন করা সম্ভব নহে সেখানে সস্তা দেশজ ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ ও য়ুনানী ব্যবস্থা ছাড়াও হোমিও-প্যাথি, বাইওকেমিক, প্রাকৃতিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই সব চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজ ও সস্তা এবং ভারতের অবস্থার অনুকূল। তাই বলিয়া এ্যালোপাথি বর্জ্জন ও দূর করিবার প্রয়োজন নাই। সকল ব্যবস্থার সমন্বয়ই কাম্য।

শিক্ষা

১৯৪১ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের মাত্র শতকরা ১২ জন লোক শিক্ষিত। অন্যান্য দেশের শিক্ষিতের হিসাব এইরূপ :

	সাল	শতকরা হিসাব
বৃটেন	১৯২১	৭৬·১
আমেরিকা	১৯২০	৭৪·৫
কানাডা	১৯২১	৭১·৬

জাপান ১৯২৫ ৭১.৭

ভারতে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও যুক্তি দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

শিক্ষা বিষয়টি পাঁচ ভাগে বিচার করা যাইতে পারে

১। শিশু শিক্ষা

২। তালিমী শিক্ষা

৩। মাধ্যমিক শিক্ষা

৪। বিশ্ববিদ্যালয়

৫। বয়স্কদের শিক্ষা

শিশু শিক্ষা: তালিমী স্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশে অল্পই মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। আচার্য্য গিজুভাইয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমকে ধন্যবাদ, তাঁহার চেষ্টাতে একমাত্র গুজরাটেই শিশুশিক্ষা কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। যদিও গৃহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিশু বিদ্যালয়, তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে অধিকাংশ পিতামাতা ৩ হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের সর্ব্বত্র বালক মন্দির স্থাপন করিয়া শিক্ষা সংহত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে কিণ্ডার-গার্টেন ও মণ্টেসরি ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ। এই ব্যবস্থাগুলি ভারতীয় অবস্থার সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া একটি সহজ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব।

তালিমী শিক্ষা: আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি প্রহসন।

সহর অথবা গ্রামসহ শিশুদের সংযুক্ত করিবে। শরীর ও মনের ইহা উন্নতি বিধান করিবে এবং শিশুকে দেশের মাটির সহিত যুক্ত রাখিবে। তাহার সম্মুখে থাকিবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি যাহা লাভ করিবার জন্য সে তাহার শিশুবিদ্যালয় হইতেই নিজের কাজের অংশ গ্রহণ করিবে।" * ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনায় তালিমী শিক্ষা সাত বৎসরের জন্য বিনা বেতনে দেওয়া হইবে। এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আধুনিক ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত যতটা সাধার জ্ঞান জন্মে এই শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও ততটা জ্ঞান লাভ হইবে। তাহাতে ইংরেজী বর্জ্জিত হইয়াছে বটে, পরিবর্ত্তে অনেকখানি অর্থকরী স্বেচ্ছাগ্রহণীয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছেলেমেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যতদূর সম্ভব লাভজনক কাজের মধ্য দিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইবে। অর্থাৎ শিক্ষার দুইটি উদ্দেশ্য থাকিবে। শিক্ষার ব্যয় শিক্ষার্থীর কাজ হইতে লব্ধ আয় হইতেই চলিয়া যাইবে এবং শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ সত্তা পূর্ণ বিকশিত হইবে। স্কুলের জমি, বাড়ী ও অন্যান্য উপকরণ যে ছাত্রদের শ্রমলব্ধ অর্থে ক্রয় করা হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। † পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীরা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার নীতি সমর্থন করিয়াছেন! এমনকি ভারত গবর্ণমেণ্টও ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে সাধারণ শিক্ষার জন্য ইহাকেই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তালিমী স্কুল পরিচালনার ভার দেওয়া হইবে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর। সহরেও তালিমী স্কুল থাকিবে তবে সেখানে হাতে কলমে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রাম হইতে স্বতন্ত্র হইবে।

* Constructive Programme-p. 13. † Harijan 2-10-1937

মাধ্যমিক শিক্ষা :—মাধ্যমিক শিক্ষা তালিমী শিক্ষারই ক্রমপরিণতি। তালিমী স্কুলে যাহা শিক্ষা পাইবে তাহাই বিশদভাবে কঠিনতর অর্থকরী দিকগুলি ৩ বৎসরের জন্য মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এইরূপ সমন্বয়ের নীতি মাধ্যমিক ও আরও উচ্চস্তরে চলিতে থাকিবে।

এইখানে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া দরকার যে মাধ্যমিক শিক্ষা একটি সম্পূর্ণ স্তর, কলেজের শিক্ষার জন্য প্রারম্ভিক কিছু নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা :—বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহার মোট ছাত্র সংখ্যা ১৭৬,২৯১।* "এই তথাকথিত শিক্ষা একেবারেই অপব্যয় এবং ইহার ফলে শিক্ষিতের মধ্যে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও দুঃখের বিষয়, যে ছাত্রছাত্রীদের কলেজে শিক্ষালাভ করিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছে তাহাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"† কাজেই আধুনিক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে প্রধানত গবেষণা ও উচ্চতর টেকনিক্যাল বিষয়ে। রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যাগুলিতে কেবল সেই সব যুবকদেরই শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাদের রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করিতে আহ্বান করা হইবে। উদাহরণ হিসাবে ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, গ্রামের অন্যান্য কর্ম্মী প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাদের শিক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে। শিক্ষার আর সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উৎসাহ দিতে হইবে। কোনও কোনও রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণ করিবে, পরীক্ষার জন্য প্রাপ্য ফি দিয়াই তাহা চলিয়া যাইবে।$

* Mr. John Sargent's-Report, Appendix Table D.
†Harijan 9-7-1938 $ Harijan 9-7-1938

শিক্ষার বাহন :—জাতীয় শক্তির বিপুল অপব্যয় নিবারণের জন্য সর্বত্রই মাতৃভাষার মারফতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। "ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা নিবার চেষ্টাতে জাতীয় শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, লোকের আয়ু কমিয়াছে। এই শিক্ষার ফলে লোকে জনসাধারণ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলেই শিক্ষার খরচ অনাবশ্যক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে জাতির আত্মার অপমৃত্যু হইবে। শিক্ষিত ভারতবাসীরা যত শীঘ্র বিদেশী মাধ্যমের মোহ ঝাড়িয়া ফলিতে পারিবে, ততই দেশ ও দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গল।" যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্তি না পাই, অন্তত ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবেই।

এই সমস্যার বিশদ আলোচনার জন্য মৎপ্রণীত The medium of Instruction পুস্তিকাখানির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বয়স্কদের শিক্ষা :—বয়স্কদের জন্য 'থ্রি আর্' শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নহে। আক্ষরিক শিক্ষা পথ মাত্র, আদর্শ নহে। বয়স্কদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে দেশের লোকের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করা। অর্থনৈতিক উন্নতি করা এইজন্য প্রয়োজন যে আর্থিক সাচ্ছল্য না থাকিলে জনসাধারণ পড়িবার মত উৎসাহ সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

"অর্থনৈতিক দিক হইতেই শিক্ষার আরম্ভ সব দিক হইতেই ভাল। মানুষের স্বার্থ যেখানে সেখানেই মানুষ সর্বাপেক্ষা ভালভাবে শিক্ষালাভ করে। প্রয়োজন স্বার্থ নিরূপণ করে।"* কাজেই বয়স্কদের

* Masters of Their Own Destiny—M. M. Coady p 112

শিক্ষাব্যবস্থায় অর্থনীতি প্রধান স্থান অধিকার করিবে। কোনও কাজ হাতে কলমে করিয়া শিক্ষালাভ করিলে তাহা শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা ভাল করিবে। তালিমী শিক্ষার মত বয়স্কদের শিক্ষাও লাভজনক অর্থকরী শিক্ষার মারফতেই দেওয়া হইবে। কোনও একটি অর্থকরী কাজ ভালভাবে শিখিবার সময় 'থ্রি আর' ত শিখিবেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার ও সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে।

বলা বাহুল্য যে অজ্ঞ বয়স্কদের সস্তায় বিভিন্ন বিষয়ে বই দিতে হইবে। এই ধরণের বই না থাকিলে আবার তাহারা মুর্খ হইয়া পড়িবে। জাতির সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না।

গ্রামের যাত্রা, পালাগান, লোক নৃত্য, লোক সাহিত্যের সমবেত সঙ্গীত প্রভৃতির পুনরুজ্জীবন বয়স্কদের শিক্ষার অন্তর্গত হইবে।

ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওর

ভারতবর্ষের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে নানা কাজের জন্য দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা জোগান দেওয়া প্রয়োজন হইবে। এই জন্য ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহা ব্যক্তিবিশেষের অধীনে রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। সাধারণের স্বার্থের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। চীনের 'কৃষি ব্যাঙ্কের' মত গ্রামের জন্য ইহার একটি বিশেষ বিভাগ থাকিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অগ্রসর হইলে বীমার

বিশেষ করিয়া কৃষি বীমার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। এ দিকেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর এই কাজ ছাড়িয়া না দিয়া জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রের নিজেরই ইহা গ্রহণ করা উচিত। হয়ত এখনকার সব ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রের ক্রয় করিতে হইবে, আর না হয় তাহাদের উপর অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়া তাহাদের ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া টাকা খাটানো ও সুদের হারের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। জাতির স্বার্থের রক্ষে ঘর নিজে সামলাইবার অধিকারী হওয়া খুবই প্রয়োজনীয়— ব্যাঙ্ক ও মহাজনের যাদুর প্রভাবের মধ্যে গিয়া পড়া কোনই কাজের কথা নহে।

হিসাব ও গবেষণা

বর্ত্তমানে যে উপায়ে অর্থনৈতিক, টেকনিকাল ও বৈজ্ঞানিক হিসাব সংগ্রহ করা হয় তাহা ক্রটিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বর্ত্তমানে আভ্যন্তরিণ ব্যবসা, ফল ও শাকসব্জী উৎপাদন, ডেয়ারি, গবাদি পশু, কুটীর-শিল্প প্রভৃতির হিসাব গ্রহণের কোন বন্দোবস্ত নাই। যে সকল হিসাব পাওয়া যায় তাহাও নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বলা যায় না বোলে—রবার্টসন রিপোর্টে হিসাব গ্রহণ পদ্ধতির উন্নতির জন্য জোর দেওয়া হইয়াছে। সরাসরি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে Bureau of Survey and Statistics গঠন করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের শাখা স্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান হিসাবের পদ্ধতিও পরিবর্ত্তন করা দরকার। যে উপায়ে

গড় হিসাবে বাহির করা হয় তাহা অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। দেশের অর্থবান ব্যক্তিদের আয় দশগুণ বাড়াইয়া প্রমাণ করা যায় যে দেশের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে! কিন্তু গরীবেরা যে কঠোর দারিদ্রের মধ্যে ছিল, তাহারা সেখানেই আছে। তেমনি ভারতবর্ষের লোকে মাথা পিছু ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার করে বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। আমরা জানি জন-সংখ্যার একাংশ শত-শত গজ কাপড় ব্যবহার করে এবং অধিকাংশ নগ্ন অথবা অর্দ্ধনগ্ন হইয়া কাল কাটায়। কাজেই আমাদের হিসাব আরও বাস্তব হওয়া প্রয়োজন এবং হিসাব হইতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি যেন দেখিতে পাওয়া যায়।

গবেষণার সংগঠনও অতি সামান্য। জাতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা যানবাহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল গবেষণার ব্যবস্থা করিতে হইবেই। গবেষণা বিভাগ জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবে।

ব্যবসা ও বণ্টন ব্যবস্থা

আভ্যন্তরিণ ব্যবসা

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সংগঠিত হইলে ব্যবসার প্রয়োজন খুবই কমিয়া যাইবে। সেই আভ্যন্তরিণ ব্যবসা এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে স্থানীয় পণ্য অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া যায়। এইভাবে দালালের শোষণের হাত হইতে বাঁচা যাইবে; মূল্য মোটামুটি স্থির থাকিবে এবং

দেশের যানবাহন, ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাব্যবস্থার উপর অনাবশ্যক চাপ পড়িবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিভিন্ন পণ্যের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার একক ভিন্ন আকারের হইবে। কখনও হয়ত গ্রাম অথবা তালুক, কখনও বা জেলা অথবা প্রদেশ। সাধারণত একটি পাঁচ মাইল ব্যাসার্দ্ধ বিশিষ্ট গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রাম খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের ব্যাপারে অন্তত স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে।

এই ধরণের অর্থনৈতিক এককগুলি আধুনিক প্রাদেশিক সীমায় বিভক্ত না হইলেও চলে। কারণ এই সীমা বিভাগ যুক্তিসহ অথবা বৈজ্ঞানিক নহে। ভাষা ও অর্থনৈতিক কারণ বিবেচনা করিয়া প্রদেশ পুনর্গঠিত হইবে।

বিভিন্ন গ্রাম্য সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সুবিধার জন্য তাহাদেরই নিয়ন্ত্রনাধীনে আভ্যন্তরিণ ব্যবসা সামান্য কিছু চলিবে। রাষ্ট্রের নির্দ্দিষ্ট মূল্য, লাভ ও বিক্রয়ের স্থান মানিয়া লইলে ব্যক্তির হাতেও আভ্যন্তরিণ ব্যবসা কিছু কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। একটি অর্থনৈতিক ইউনিট তাহার অতিরিক্ত পণ্যই চালান দিতে পারিবে অথবা এমন জিনিষ দিবে যাহা একমাত্র সেই জায়গাতেই উৎপন্ন অথবা তৈয়ারী হয়। যাহা এক জায়গায় উৎপন্ন হয় না তাহাই আমদানী করিতে পারিবে, তবে সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছু কিছু অবশ্যই উৎপাদন করিতে হইবে। তুলা বস্ত্র বয়নে অপরিহার্য্য কিন্তু সর্ব্বত্র তুলা হয় না, সেখানে তুলা চালান আসিবে। এখন কেবল টাকার জন্যই তুলার চাষ হয়। গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা দেশের অনেক জায়গাতেই তুলা উৎপাদন সম্ভব হইবে। "পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য ইহা হওয়া উচিত যে

পরিহার্য বিনিময় যথাসম্ভব পরিহার করিয়া জাতির শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।"* উৎপাদক ও গ্রাহকের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা ক্রমে তুলিয়া দিতে হইবে। গ্রাহকই তাহার নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন করিবে এবং উৎপাদকও গ্রাহক হইবে।

বণ্টন-ব্যবস্থা

উৎপাদন ও বণ্টন একই স্থানে চলিতে থাকিলে বণ্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল হইয়া পড়িবে। কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জটিল বণ্টন ব্যবস্থা আপনা হইতেই পরিবেশের সহিত মানাইয়া লয়, এবং যাহা ন্যায়পূর্ণ, তাহার অভাবে জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও তাহা ধনী লোকদের আরও ধনী করিতে সাহায্য করিবে মাত্র।

উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িলে, রাষ্ট্র মৌলিক শিল্প ও পাবলিক ইউটিলিটি গ্রহণ করিবে; যাহারা অলস সুদখোর জাতীয় পরিকল্পনার ভিতরে তাহাদের কোনও অস্তিত্বই থাকিবে না। সুদ ও লাভের যে কুফল তাহা দূর হইবে এবং আয়ের অসাম্য অনেক কমিয়া যাইবে।

সহরের অবস্থা

নাগরিক হিসাব হইতে সহর গ্রামের লোক ও সংখ্যার হিসাব বুঝা যাইবে।

*Principles of planning—K.T. Shah p.89.

	১৯৪১		১৯৩১	
	আবাস	জনসংখ্যা	আবাস	জনসংখ্যা
মোট জনসংখ্যা	৬৫৮,৫৯৫	৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ	৬৬৬,৯২৪	৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ
গ্রাম	৬৫৫,৮৯২	৩৩ „ ৯৩ „	৬৬৪,৪৪৪	৩০ কোটি ৩ „
সহর	২.৭০২	৪০ „ ৯৭ „	২,৪৮০	৩ কোটি ৭৪ „

শতকরা জনসংখ্যা

	১৯৪১	১৯৩১
মোট জনসংখ্যা	১০০	১০০
গ্রাম	৮৭	৮৯
সহর	১৩	১১

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সহরের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ। ১৯৪১ সালের হিসাব মত ভারতবর্ষের মাত্র ৪০টি সহরে এক লক্ষের বেশী জনসংখ্যা। সহরের জনসংখ্যার হার আসাম ২.৮ হইতে বম্বেতে ২৬.০। বম্বে প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহরগত। ইহার সহিত তুলনায় ফরাসী দেশে সহরে অধিবাসী শতকরা ৪৯, উত্তর আয়ারলণ্ডে ৫০.৮, ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে শতকরা ৮০, এবং আমেরিকাতে ৫৬.২।*

সহরে ভীড়ের সমস্যা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত কম। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সহর সম্বন্ধে নীচের বিষয় কয়েকটি স্মরণ রাখিলেই চলিবে।

(ক) ভীড় ও শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়া বাধা দিবার জন্য সহরের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দিতে হইবে না।

(খ) বর্ত্তমান সহরগুলিতে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠন করিয়া স্বাস্থ্য,

*Indian Year Book 1943—44

গ্রামের প্রয়োগের ব্যবস্থা, শিক্ষা, ব্যবসা ও শিল্পের দিকে দৃষ্টি দিয়া উন্নত করিতে হইবে।

(গ) বড় বড় অথবা মৌলিক শিল্পগুলিকে এখনকার মত সহরে ভীড় করিতে দেওয়া হইবে না। কাছাকাছি গ্রামে সেগুলি সরাইয়া কেন্দ্র-বিচ্যুত করিতে হইবে।

(ঘ) গ্রামে যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অনায়াসে তৈয়ারী করা যায় তাহা সহরে উৎপাদন করিতে দেওয়া হইবে না। সহরের শিল্প গ্রামের শিল্পের পরিপূরক হইবে মাত্র! গ্রামের উৎপন্ন জিনিসের বেচাকেনার জায়গা হইবে সহর।

(ঙ) স্বয়ংসম্পূর্ণতার উদ্দেশ্যের দিক হইতেও সহরগুলি দূরস্থ অন্য সহর অথবা প্রদেশের উপর নির্ভর না করিয়া আশেপাশের গ্রামের উপরেই নির্ভর করিবে। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক হইতে সহরের আকার নির্ভর করিবে জনসংখ্যার উপরে। অবশ্য শস্যোৎপাদন না হওয়া, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সময়ে ইউনিট বড় করিয়া ধরিতে হইবে।

এই সব উপায়ে বর্ত্তমান ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে গ্রাম হইতে সহরে অর্থনৈতিক শোষণ চলে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক দাবী হইবে সহর হইতে গ্রামের দিকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুধু বিভিন্ন দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য পরস্পরের সুবিধার্থে বিনিময় হইবে। দেশের প্রকৃত অভাব ও চাহিদা মিটাইবার জন্যই মাত্র আমদানী

করা হইবে। আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লোভ ও শোষণের জন্য। ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও রক্তস্রাবী যুদ্ধ অনিবার্য্য। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ দুর্ব্বল কোন জাতিকে শোষণকার্য্যে যোগ দিবে না, অপর কোন দেশকে নিজের দেশ শোষণ করিতেও দিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষ বৈদেশিক বাণিজ্য পরিহার করিবে না। উদাহরণ-স্বরূপ বিশেষ শ্রেণীর যন্ত্র ঔষধ প্রভৃতি আমদানী করিতে ভারতবর্ষ আদৌ ইতঃস্তত করিবে না; অবশ্য যদি তাহা ভারতবর্ষে তৈয়ারী সম্ভব না হয় তবেই। তেমনি অপর কোন দেশ যদি ভারতেই মাত্র উৎপন্ন হয় এমন জিনিস চায় তাহা হইলে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করিবে না। এই বিনিময়ে দুই দেশেরই উপকার, কাজেই তাহা কাম্য। "বৈদেশিক পণ্য বিদেশী বলিয়াই বর্জ্জন করা এবং দেশের টাকা ও সময় ঐ জিনিস তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যয় করা একটি বিশেষ অপরাধ এবং তাহা স্বদেশী নীতির বিরোধী।"* তেমনি আবার যে জিনিস অনায়াসে দেশে তৈয়ারী হইতে পারে এবং তৈয়ারীতে বহু লোক নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করাও অপরাধ। পৃথিবীতে যদি একটি সুপরিকল্পিত অর্থনীতি চলিতে থাকে তাহা হইলে দুর্ব্বল জাতির মাল চালিয়া দিয়া, সাম্রাজ্যের বিশেষ সুবিধা ও সাম্রাজ্য-বাদী ধমক দিয়া শোষণ করিবার পথ থাকিবে না।

একজন ব্যক্তি অথবা গ্রাম্য সম্প্রদায় যেমন আভ্যন্তরিণ ব্যবসার এজেন্ট মাত্র, তেমনি জাতি হইবে বহির্বাণিজ্যের এজেন্ট। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের জাতীয় গবর্ণমেণ্টই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিবে। ইহা ব্যবসায়ীদের হাতে

* Young India 18-6-1931

ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, কারণ তাহারা জাতির স্বার্থ নিজের লাভের পূর্ব্বে চিন্তা করিতে পারে না।

ডোডো পাখীর মত অবাধ বাণিজ্য এখন মৃত। "ইংলণ্ড নিজের তৈরী মাল অসহায় লোকদের উপর ঢালিয়া দেয় এবং চায় যে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপর দেশ হইতে অল্প দামে চালান আসুক। তাহার পক্ষে অবাধ বাণিজ্য ভালই। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য ভারতের কৃষকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার কুটীর-শিল্প ধ্বংশ করিয়াছে। তাহা ছাড়া কোনও নূতন ব্যবসাই সংরক্ষিত না হইলে বিদেশী প্রতিযোগিতার কাছে টিঁকিতে পারিবে না।*" সেইজন্য ভারতের উচিত কয়েকটি দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা উচ্চ কর বসানো। "ভারতীয় ও ইংরেজ স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য না করিবার অর্থ ভারতবর্ষের দাসত্ব চিরস্থায়ী করা। দৈত্য ও বামনের মধ্যে সমান অধিকারের কথায় লাভ কি? অসমান যাহারা তাহাদের মধ্যে সমানাধিকারের কথা বলিবার পূর্ব্বে বামনকে দৈত্যের দৈর্ঘ্য দান করিতে হইবে।"†

শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্য

কৃষি, কুটীরশিল্প, ব্যাপক শিল্প, কারখানা ও পাবলিক ইউটিলিটিতে নিযুক্ত শ্রমিকের স্বার্থ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ে আইন দ্বারা সংরক্ষিত হইবে:

(ক) জীবন ধারণোপযোগী মজুরী

(খ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা

* Young India 15-5-24 † Young India 26-3-31

(গ) কাজের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করা।

(ঘ) মালিক ও শ্রমিকের বিবাদ মিটাইবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(ঙ) বার্দ্ধক্য, রোগ, দুর্ঘটনা ও কর্ম্মহীনতায় আর্থিক পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা। মালিক ও শ্রমিক উভয়ের দেয় বীমা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

কংগ্রেসের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ-সূত্র রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে:

১। দাসত্ব অথবা অনুরূপ অবস্থা হইতে শ্রমিককে মুক্ত করিতে হইবে।

২। নারী শ্রমিক রক্ষার ব্যবস্থা, প্রসবের সময়ে যথেষ্ট ছুটির ব্যবস্থা।

৩। যে সব ছেলেমেয়ের স্কুলে যাইবার মত বয়স তাহাদের ফ্যাক্টরী অথবা খনিতে নিযুক্ত করা যাইবে না।

৪। নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘ গঠন করিয়া শ্রমিক ও কৃষকের নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে।

শ্রমিকের মঙ্গল সাধন ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রকৃতপ্রস্তাবে গান্ধীজির আদর্শ অনুযায়ী কি ভাবে করা যায় তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে আমেদাবাদের বয়ন শ্রমিক সঙ্ঘের কর্ম্মপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

জন সমস্যা

ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে পৃথিবীর আরও অনেক দেশের মত ভারতবর্ষেরও একটি বাস্তব জনসমস্যা রহিয়াছে। কিন্তু

এই সমস্যার গুরুত্বের উপর ভারতীয় বা বিদেশী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকেরা একটু বেশী জোর দিয়াছেন। মিঃ আমেরী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দুভিক্ষের কারণ এদেশে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি। মিঃ চার্চিলও বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা "পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে"। এই সব উক্তি যে ভুল তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—*

১৮৮১-১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ইংলণ্ড ও ওয়েলস	৫০	জাপান	৭৪
হল্যাণ্ড	৯০	যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	১৮৬
অষ্ট্রেলিয়া	১৬৬	ভারতবর্ষ	
নিউজিল্যাণ্ড	১৭২	(ব্রহ্মদেশ ছাড়া)	৩৫

ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ও নিউজিল্যাণ্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বিদেশী লোক ঐ সব দেশে বসতি করিয়াছে। যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের সম্মুখে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনও অসাধারণ সমস্যা নাই।

ইহা সত্য যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে জনসংখ্যা কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে কৃত্রিম জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা [illegible] ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে। এই সব কৃত্রিম উপায়ের প্রতি গান্ধীজির মতামত সকলেরই জানা আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তাঁহার মতে 'গভীর পাপ'। "ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বিশেষ অবস্থাতে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থনযোগ্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ

* The Measurement of Population Growth—R. R. Kueznski.

অবলম্বন করা সম্ভব নহে। আমার কাছে লোককে আত্মসংযম শিক্ষা দেওয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা সহজ মনে হয়।"

"কৃত্রিম উপায়কে পাপের সহায়ক বলা যাইতে পারে। উহাতে স্ত্রী পুরুষ অসংযত হইয়া পরে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে ক্লৈব্য ও স্নায়ুর পীড়া জন্মিতে পারে। আরোগ্যই রোগের চাইতে খারাপ প্রতীয়মান হইবে।"*

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যাহাতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য একমাত্র বাস্তব উপায় জনগণকে আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া। জীবন ধারণের মান উন্নত হইলেও বর্ত্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা পড়িবে।

করনীতি ও মুদ্রানীতি

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান করনীতি উপর দিকে ভারী ও অন্যায়। কাজেই তাহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

গত তিন দশকে ভারতবর্ষের শাসনব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জি, কে, গোখেল বলিয়াছেন :

"শাসনব্যয় বৃদ্ধি মাত্রেই দুঃখ অথবা ভয়ের কারণ নাই। কি উদ্দেশ্য লইয়া ব্যয়ভার বৃদ্ধি করা হইল এবং সাধারণের নিকট হইতে লব্ধ অর্থ দ্বারা কি ফল পাওয়া গেল তাহার উপরেই সব নির্ভর করে।"

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন "রাজা যে কর আদায় করেন তাহা সূর্য্যকিরণে পৃথিবীর জল বাষ্প হওয়ার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে

* Self-Restraint vs Self-Indulgence—M. K. Gandhi, p. 51

পারে। উহাই আবার বৃষ্টির আকারে পতিত হইয়া ভূমি উর্ব্বর করে।” “ভারতের ভূমি হইতে যে বাষ্প শুষিয়া লওয়া হইতেছে তাহা ভারতবর্ষের বাহিরে অন্য দেশের ভূমিতে বৃষ্টির মত পড়িয়া তাহা উর্ব্বর করিতেছে।”*

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এদেশের করনীতির বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করা সম্ভব নহে। শুধু নিম্নলিখিত বিশেষ বিষয়গুলি উল্লেখ করিতেছি :

(ক) ন্যায়ের ভিত্তিতে কর ধার্য্য করা হইবে ; গরীব করদাতাদের উপর বেশী করভার চাপানো হইবে না।

(খ) এই দিক হইতে আয় কর ও অতিরিক্ত করের মত প্রত্যক্ষ কর আরও অধিক মাত্রায় ক্রমোচ্চ করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।

(গ) লবণের উপর কর তুলিয়া দিতে হইবে।

(ঘ) মাদক দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করিয়া যে আয় হয় তাহা বন্ধ করিতে হইবে। ঔষধার্থে ব্যতীত মাদক দ্রব্য একেবারেই বর্জ্জন করা হইবে।

(ঙ) কৃষি আয়ের একটি যুক্তিসম্মত নিম্নতম আয়ের পর হইতে ক্রমোচ্চ হারে কর ধার্য্য করা হইবে।

(চ) নির্দ্দিষ্ট নিম্নতম সম্পত্তি ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার উত্তরাধিকারের উপরে ক্রমোচ্চ হারে কর ধার্য্য হইবে।

(ছ) কৃষকদের কষ্টমোচন করিবার জন্য তাহাদের দেয় খাজনা যথেষ্ট পরিমাণে কমাইতে হইবে। যে জমি হইতে আয় হয় না তাহা হইতে খাজনা লওয়া হইবে না।

(জ) প্রাচীন কালে টাকার পরিবর্তে জিনিস দিয়া যে কর দিবার প্রথা ছিল তাহা বিশেষ করিয়া গ্রামে পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

* Economic History of India under British Rule

(ঝ) সামরিক ব্যয় প্রভৃত পরিমাণে কমাইতে বর্ত্তমান অপেক্ষা অন্তত অর্দ্ধেক করিতে হইবে।

(ঞ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং গবেষণা প্রভৃতি পাবলিক ইউটিলিটির ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(ট) সিভিল সার্ভিস বিভাগের ব্যয় অনেক কমাইতে হইবে। বিশেষভাবে নিযুক্ত অভিজ্ঞ লোক ছাড়া রাষ্ট্রের কোনও কর্ম্মচারীর বেতন একটি নির্দ্দিষ্ট উচ্চতম অঙ্কের অধিক হইতে পারিবে না। সাধারণতঃ উহা পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান পদের ব্যয়ের হিসাব পর্য্যালোচনা করা কৌতূহলোদ্দীপক :*

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী	৮০০০	পাউণ্ড	বৎসরে
ইংলণ্ডের অন্যান্য মন্ত্রী	৫০০০	"	"
আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট	১৫,০০০	"	"
" মন্ত্রী	৩,০০০	"	"
ভারতের গবর্ণর জেনারেল বাৎসরিক ২০,০০০ পাউণ্ড বেতন ও অন্যান্য ভাতা লইয়া বাৎসরিক	১৩০,০০০	"	উর্দ্ধে
কানাডার গবর্ণর জেনারাল	১০,০০০	"	বৎসরে
অষ্ট্রেলিয়ার "	৮,০০০	"	"
দক্ষিণ আফ্রিকার "	১০,০০০	"	"
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণর	৫০০০ হইতে ১০,০০০	"	"

* Harijan 21-8-1937

আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের গবর্ণর ১০০০
হইতে ৫০০০ পাউণ্ড বৎসরে

মুদ্রানীতি

মুদ্রানীতি নূতন করিয়া গঠন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র এমন ভাবে মুদ্রানীতি পরিচালনা করিবে যে বর্ত্তমান 'কাঁচা টাকা'-প্রীতি লোপ পায়। পণ্য বিনিময়ের জন্যই প্রধানত মুদ্রার সৃষ্টি। কিন্তু এখন টাকাই প্রধানতম পণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, টাকা এখন মানুষের সুখ শান্তি রোধ করিতে উদ্যত। বর্ত্তমানে মুদ্রানীতি এত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে যে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের গবর্ণরও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "আমি এ সব বুঝি না"। সাধারণ লোকের পক্ষে এই রহস্যময় বিষয়ের নির্ব্বাক দ্রষ্টা হওয়া ছাড়া গতি নাই। কৃষক বছরের পর বছর একই পরিমাণ শস্য উৎপাদন করে তথাপি মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি, মুদ্রা হ্রাস ও স্ফীতি প্রভৃতি তাহার নাগালের বাহিরের কতকগুলি বিষয়ের অধীন।

অতএব মুদ্রানীতি অনেকাংশে সরল ও যুক্তিসম্মত করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্র অথবা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইলে তাহাকে পুঁজিপতি অথবা শেয়ারের দালালদের ক্রীড়ণক হইতে দেওয়া হইবে না। রাষ্ট্র আমদানী, রপ্তানি, আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়, দেশের বাণিজ্যের অবস্থা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রাহ্রাস করিবে। এই উপায়ে আভ্যান্তরিণ দ্রব্যমূল্য স্থির থাকিবে। সোভিয়েট রুব্‌ল নোটের মত ক্রেতার সর্ব্বকার্য্যে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবহৃত হইবে যেমন ডাক টিকেট ডাক বিভাগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।*

*Soviet Communism—Webb, P 1195

যেহেতু বহির্বাণিজ্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় ও মূল্য দ্বারা আভ্যান্তরিণ মূল্য বিশেষ প্রভাবান্বিত হইবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রাচীন পদ্ধতিতে আমদানীর সমমূল্যের পণ্য রপ্তানী দ্বারা দাম দেওয়া হইবে। দেশের গ্রামাঞ্চলে পণ্য বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তন হইবার পর আভ্যন্তরিণ মুদ্রার প্রয়োজন অনেক কমিয়া যাইবে। ভূমি কর ও রাজস্ব মুদ্রার পরিবর্ত্তে উৎপন্ন শস্য দিবার কি সুবিধা তাহা প্রজাস্বত্ব শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রামের ডাক্তার, কারিগর, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের টাকার পরিবর্ত্তে শস্য দেওয়া যাইতে পারে; অনেক গ্রামে এখনও তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে। আভ্যন্তরিণ বাণিজ্যও অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে বলিয়া মুদ্রা ও তাহার কুফল বহু পরিমাণে কমিবে। গ্রামের লোকের পক্ষে কোনও একটি পণ্যের তুলনায় যদি একটি মুদ্রার মান নির্দ্দিষ্ট করা হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট; এই মুদ্রার মূল্য কোনও একটি দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিস, খাদ্য, বস্ত্র অথবা দুগ্ধের তুলনায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে গোপুরিতে (ওয়ার্ধা) যে চরকার সুতার বিনিময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা কৌতুহলোদ্দীপক।*

শাসন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই পরিকল্পনার অবলম্বন হইতেছে উৎপাদন কেন্দ্রচ্যুত করা। এই নীতি শাসন ব্যাপারেও অবলম্বিত হইবে।

* Harijan 22-3-1942

শাসনের সর্ব্বনিম্ন স্তর হইবে গ্রামের পঞ্চায়েৎ, তাহার আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে অনেক স্বাধীনতা থাকিবে। ধরা যাক ১০টি, অথবা অনুরূপ সংখ্যক কয়েকটি গ্রাম লইয়া গ্রাম্য পরিষদ অথবা গ্রাম্য সঙ্ঘ পঞ্চায়েৎ নাম দিয়া সর্ব্বনিম্ন শাসন ব্যবস্থা গঠিত হইবে। এই ধরণের কয়েকটি গ্রামের সঙ্ঘ একত্রিত হইয়া বর্ত্তমান তালুক অথবা তহশীলের মত উচ্চতর শাসন ব্যবস্থা গঠন করিবে। কয়েকটি তালুক লইয়া জেলা পরিষদ থাকিবে। সহরে মিউনিসিপ্যালিটি থাকিবে। জেলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটির উপরে থাকিবে বিভাগীয় অথবা প্রাদেশিক পরিষদ। প্রাদেশিক পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। এই কেন্দ্রীয় পরিষদই জাতীয় সর্ব্বোচ্চ আইনসভা হইবে। নির্ব্বাচন ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠনে বয়স্কদের সকলেরই প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার থাকিবে। কিন্তু উচ্চতর পরিষদে পরোক্ষ নির্ব্বাচন হইবে। নীচের পরিষদ উচ্চতর পরিষদের জন্য নির্ব্বাচন করিবে। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েৎ তহশিল, জেলা, বিভাগ, প্রদেশ ও দেশের সমগ্র শাসন ব্যাপারের সাহিত যুক্ত থাকিবে, তথাপি তাহাই হইবে দেশের শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনযুক্ত একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি থাকিবে বটে, কিন্তু গ্রাম পরিষদ পুনরুজ্জীবনের উপরে বিশেষ জোর দিয়া তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতাও দিতে হইবে।

প্রস্তাবিত শাসন-ব্যবস্থার ইহা হইতেছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বাহ্যিক সীমারেখা। ইহা অপেক্ষা বিশদ শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নহে।

আয় ব্যয়

এ পর্য্যন্ত মূল নীতি ও সাধারণ উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন পরিকল্পনার আর্থিক দিকটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে এককালীন ও পৌনপৌনিক ব্যয় এবং আয়ের মোটামুটি হিসাব আলোচনা করা উচিত। হিসাব সবই যুদ্ধের আগেকার মূল্যের হিসাবে দেওয়া হইল।

ব্যয়ের হিসাব

(ক) কৃষি—প্রথমে কৃষির কথাই ধরা যাক। ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্য জমির বর্ত্তমান দেয় খাজানার দশগুণ হিসাবে ২০০ কোটি টাকা লাগিবে।* চাষোপযোগী পতিত ১৭ কোটি একর জমি উদ্ধার করিতে প্রতি একরে ২০৲ টাকা হিসাবে ৩৫০ কোটি টাকা লাগিবে। ভূমিক্ষয় নিবারণ করিবার জন্য ১০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়। এই দুই খাতে পৌনপৌনিক ব্যয় বৎসরে ৫ কোটি টাকা লাগিবে।

১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের পয়ঃপ্রণালীগুলির জন্য ১৫৩ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যত খাল ও নালা আছে তাহা দ্বিগুণ করার প্রয়োজন হইবে ধরিলে এই ব্যাপারে ১৫০ কোটি টাকা লাগিবে। কূপ, পুকুর প্রভৃতি খালের জন্য আরও ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। পৌনপৌনিক ব্যয় হইবে ৫ কোটি টাকা। দশ বৎসরে পরীক্ষামূলক

*Principles of Planning – K. T. Shah p. 37

কার্যের জন্য ১০০ কোটি টাকা লাগিবে। এই ফার্মগুলি গ্রামের লোকের আদর্শ হইবে। এই ফার্ম হইতে যে আয় হইবে তাহা ধরিয়া এই বাবদ পৌনপৌনিক ব্যয় ২৫ কোটি টাকা হইবে।

ইহা ছাড়া চাষীদের চাষের উন্নত যন্ত্রপাতি গবাদি পশুর উন্নতি ও অপরাপর কৃষি উন্নতির সহায়তার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতি গ্রামে ৪০০০৲ টাকা করিয়া লাগিবে ধরিলে কৃষির উন্নতির জন্য মোট ২৫০ কোটি টাকা লাগিবে। এই ব্যয় বারে বারে হইবে না, এবং ২০ বৎসরের মধ্যে শোধ হইয়া যাইবে।

পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে কৃষির উন্নতির জন্য মোট ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইবে ঃ

		এককালীন	পৌনপৌনিক
ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা	—	২০০ কোটি	—
ভূমি উদ্ধার	—	৩৫০ ,,	৫ কোটি
ভূমি ক্ষয় নিরারণ	—	১০০ ,,	৫ ,,
জলসেচ	—	১৭৫ ,,	৫ ,,
পরীক্ষামূলক ফার্ম	—	১০০ ,,	২৫ ,,
কৃষি ঋণ	—	২৫০ ,,	[illegible]
মোট	...	১,১৭৫ ,,	৪০ ,,

এই পরিমাণ টাকা ব্যয় করিলে ১০ বৎসরে কৃষি হইতে আয় দ্বিগুণ হইয়া যাইবে।

(খ) কুটীর-শিল্প—কুটীর-শিল্পের প্রধান প্রয়োজন সহজ উপায়ে ঋণ পাইবার সুবিধা। কৃষির সহিত যুক্ত ও অন্যান্য কুটীর-শিল্প গড়িয়া তুলিতে প্রতি গ্রামে ৫০০০৲ লাগিবে। এই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েৎ অথবা

সমবায়-ব্যাঙ্ককে ২০ বৎসরের মেয়াদে ধার দেওয়া হইবে। ঋণ দিবার এই সহজলভ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য এককালীন ব্যয় হইবে ৩৫০ কোটি টাকা।

(গ) মৌলিক ও অন্যান্য বড় বড় কারখানা জাত শিল্প :—বড় বড় শিল্প গড়িয়া তুলিতে ভারতবর্ষে কত টাকা লাগিতে পারে তাহার নির্ভুল হিসাব দেওয়া শক্ত। বর্তমানে অনুরূপ শিল্পে কত টাকা খাটিতেছে তাহারও কোনও হিসাব পাওয়া যায় না। স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়ার* মতে ভারতবর্ষে মোট ৭৫০ কোটি টাকা শিল্পে খাটিতেছে। তাহার মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার মালিক বিদেশীরা। অবশিষ্ট ৪৫০ কোটি টাকার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা মৌলিক শিল্পে নিয়োজিত এবং তাহার মালিক ভারতবাসী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিদেশীর অধীন শিল্প ও মৌলিক শিল্প রাষ্ট্রের ১০ বৎসরের মধ্যে কিনিয়া লইতে হইবে। ইহাতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। রাষ্ট্র যদি মৌলিক শিল্পের উন্নতির জন্য আরও ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করে তাহা হইলে এই বাবদে মোট ১০০০ কোটি টাকা খরচ হইবে।

(ঘ) পাবলিক ইউটিলিটি :—

১। যানবাহন—১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় রেলপথে মোট ৮৫০ কোটি টাকা নিয়োজিত ছিল। এই টাকার প্রায় সবই রাষ্ট্রের। ১০ বৎসরে রেলপথের দৈর্ঘ্য শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িবে ধরিয়া লইলে নূতন আরও ২০০ কোটি টাকা লাগিবে। রক্ষা করিবার জন্য পৌনপৌনিক ব্যয় হইবে আরও ৫ কোটি টাকা।

পথের বর্তমান মোট দৈর্ঘ্য ৩৫০,০০০ মাইল বলিয়া হিসাব করা

* Prosperity through Industry, p.7

হইয়াছে। আরও ২০০,০০০ মাইল পথ, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে কাঁচা পথ, নির্ম্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রতি মাইলে ৫০০০ টাকা লাগিবে ধরিয়া লইলে পথ নির্ম্মাণের খরচ হইবে ১০০ কোটি টাকা; পথ রক্ষা করিবার ব্যয় বাৎসরিক ৫ কোটি টাকা।

দেশী ও বিদেশী জাহাজের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে কিনিয়া লইবার ব্যয় ও মৌলিক বড় বড় শিল্পের জন্য নির্দ্ধারিত ৫০০ কোটি টাকা খরচের মধ্যে হিসাব করা হইয়াছে। উপকূলস্থ বন্দর গঠন ও অর্ণবপোতে যাতায়াতের উন্নতির জন্য ২৫ কোটি টাকাই আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। পরিকল্পনার কালে জাহাজি বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য ৫০ কোটি টাকা লাগিবে। উপকূলস্থ বাণিজ্য ও জাহাজি বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য পৌনপৌনিক ব্যয় হইবে ৫ কোটি টাকা।

বিমান ও ডাক বিভাগের জন্য মোট ব্যয় প্রায় ২৫ কোটি টাকা লাগিবে।

যানবাহনের জন্য মোট ব্যয়:

	এককালীন	পৌনপৌনিক
রেল	২০০ কোটি	৫ কোটি
পথ	১০০ „	৫ „
উপকূলস্থ ও জাহাজি বাণিজ্য	৭৫ „	৫
বিমান, ডাক ও টেলিগ্রাফ	২৫ „	—
	৪০০ „	১৫ „

২। জন স্বাস্থ্য:—প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া ঔষধালয়, ধাত্রী ও ডাক্তার থাকিবে। ৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি সাদাসিদা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার খরচ প্রায় ৬০০৲ টাকা। প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য মূল্য প্রায় ৫০০৲ টাকা পড়িবে। এই ব্যয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বহন

করিবে, উহার পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি টাকা। ডাক্তার ও ধাত্রীর মাহিনা সহ ডাক্তারখানা চালাইবার অর্দ্ধেক ব্যয় গ্রাম পঞ্চায়েৎ বহন করিবে, অপরার্দ্ধ করিবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট। প্রত্যেকটি গ্রামের ডাক্তারখানার জন্য বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে ধরিলে সমস্ত দেশে এই ব্যয়ের অর্দ্ধেকের পরিমাণ হইবে ৩৫ কোটি টাকা।

সহর অঞ্চলে প্রত্যেক ১০,০০০ লোকের জন্য একটি করিয়া হাসপাতাল থাকিবে। এই হিসাবে ভারতবর্ষের নাগরিকদের জন্য ৫০০০ হাসপাতাল প্রয়োজন। বর্ত্তমানে প্রায় ২০০০ হাসপাতাল আছে ধরিয়া লইলে আরও ৩০০০ হাসপাতাল প্রয়োজন। প্রসূতি ভবন সহ ৪০টি শয্যা বিশিষ্ট প্রত্যেক হাসপাতালের জন্য বাড়ী করিতে ৫০,০০০৲ টাকা লাগিবে। বাড়ী বাবদ হাসপাতালের জন্য মোট ব্যয় প্রায় ১৫ কোটি টাকা লাগিবে। প্রত্যেক হাসপাতালের পৌনপৌনিক ব্যয় ২০,০০০৲ টাকা করিয়া লাগিবে। অতএব মোট পৌনপৌনিক ব্যয় হইবে ৫ কোটি টাকা।

যক্ষা, কুষ্ঠ, ক্যান্সার, যৌনব্যাধি ও মানসিক ব্যাধির জন্য হাসপাতাল করিতে আরও ১০ কোটি টাকা লাগিবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা, জলসরবরাহ, গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্য মোট ২০০৲ টাকা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ব্যয়িত হইবে। স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের জন্য গ্রামে আরও কূপ খনন করা প্রয়োজন। যদিও গ্রামের লোকেরাই তাহাদের বাসগৃহের স্বাস্থ্য ও আলোহাওয়ার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অধিকাংশ ব্যয় বহন করিবে তথাপি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এই উদ্দেশ্যে অর্থ-সাহায্য করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ এবং বাসগৃহের উন্নতির জন্য যদি ২০০০৲ টাকা ব্যয় করা হয়